NEHRU BAL PUSTAKALAYA

নেহরু বাল পুস্তকালয়

সে অনেক কালের কথা

(দ্বিতীয় ভাগ)



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া



নেহরু বাল পুস্তকালয়—26

সে অনেক কালের কথা

(দ্বিতীয় ভাগ)

লেখক :
এম. চোকসি ও
পি. এম. যোশী
অনুবাদক :
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়
চিত্রাঙ্কন :
পুলক বিশ্বাস



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লি

First Edition 1974 (Saka 1896)
Reprinted 1983 (Saka 1905)

ONCE UPON A TIME II *(Bengali)*

মূল রচনা : ওয়ান্স আপন এ টাইম (ইংলিশ)

Rs. 2.50

Published by Director, National Book Trust, India,
A-5 Green Park, New Delhi-110016 and printed at
Jupiter Offset Press, B-10/3, Jhilmil Industrial Area,
Delhi-110032

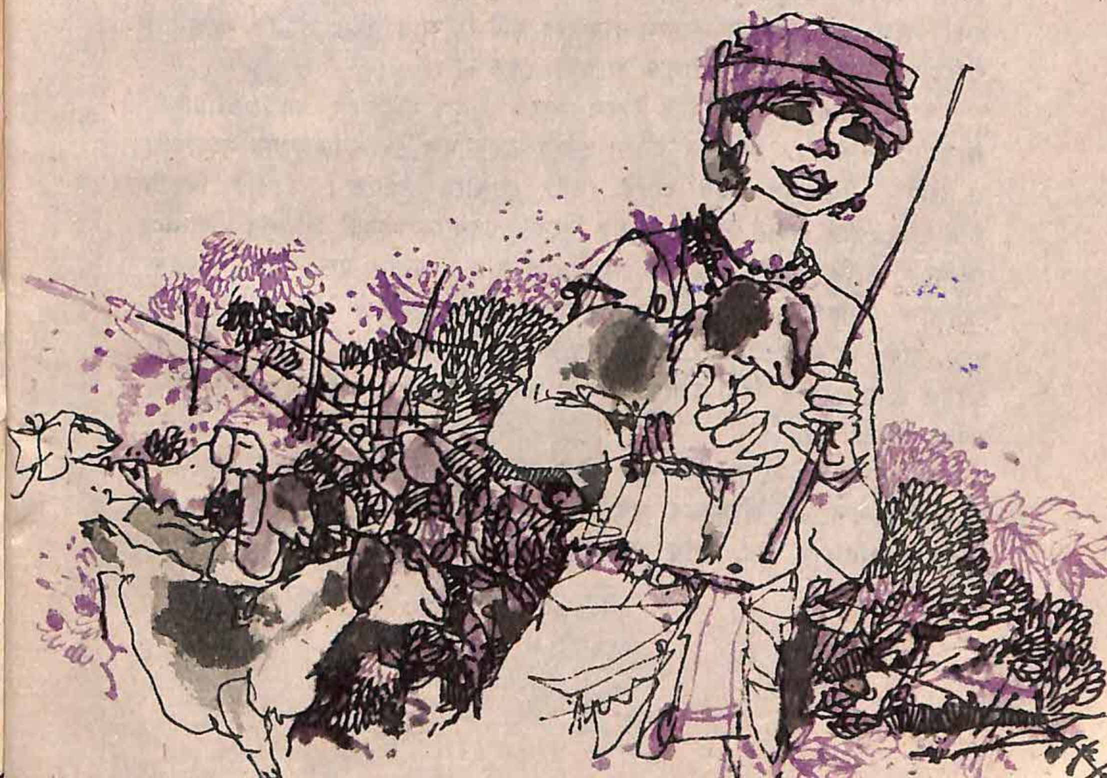
কার্লার বৌদ্ধ মঠ

জীমূত ও কার্লার ভিক্ষুদের কথা

সে অনেক দিন আগের কথা—প্রায় দু'হাজার বছর। পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার মধ্যে এক মস্ত পাহাড় কার্লা। কার্লা গুহায় ওঠবার মুখে ছিল সেই গ্রাম—বালুরাকা।

সমস্ত দাক্ষিণাত্য তখন ঘন বনে ঢাকা। বন্য জন্তুরা মানুষের বসতির কাছাকাছি চলে আসত। তখন বিখ্যাত শতবাহন বংশের রাজারা রাজত্ব করছেন—সর্বত্র শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে। জঙ্গলের ধার ঘেঁষে, যেসব গ্রাম সেখানেও লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে।

উত্তরে ভারতের সমতল ভূমিতে অনেক পথঘাট, কিন্তু এই পাহাড়ে দেশে সে সব কিছু ছিল না। পাহাড়ের পর পাহাড় ধাপে উঠে গেছে কিংবা



নেমে এসেছে, এদের বলে ঘাট। রাস্তা অবশ্য দু-একটা ছিল, তাই বেয়ে পশুরা মাল নিয়ে ওঠানামা করত।

কার্লা পাহাড়ের নীচে এই গ্রামে জীমূত বলে একটি ছোট ছেলে থাকত। তখন যীশুখৃষ্ট জন্মের পর দ্বিতীয় শতাব্দী চলছে। কাদা মাটি দিয়ে তৈরী কুঁড়ে ঘরে গ্রামবাসীরা মনের সুখে দিন কাটাত। শত্রু এবং অত্যাচারী রাজার লোকেদের হাত থেকে বাঁচলে তারা আর কিছু চাইত না।

তবে জীমূত বেচারার জীবন তত সুখের ছিল না। তার বাপ মা ছিল না, তাই সে গ্রামের বাইরে একটা কুঁড়েঘরে তার কাকা কাকিমার সঙ্গে থাকত, কাকার জমিতে ভাল ফসল ফলত না। সম্বলের মধ্যে ছিল এক পাল ছাগল। জীমূতের কাকি ছিল বেজায় বদমেজাজী আর জীমূতকে প্রায়ই বকাঝকা করত। কাকার নাম ছিল কালহা, সে লোকটিও ছিল ঝগড়াটে, তাই গ্রামের লোকে তাকে নীচের জমিতে ছাগল চরাতে দিত না। রোজ ভোরে জীমূত বেচারাকে ছাগল নিয়ে পাহাড়ের উপরে চরাতে যেতে হত, সঙ্গে এক টুকরো কালো বাজরার রুটি। আর ফিরতে হত সন্ধ্যেয়। পাহাড়ের উপরে ভাল ঘাসও পাওয়া যেত না।

খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে জীমূত মাঝপথে একটা চ্যাটালো জায়গায় থামত। সেখানে একটা গুহার মধ্যে ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংঘারাম ও গুহা। তিনশো বছর ধরেই সেটা সেখানে আছে। বিরাট বিরাট থাম চলে গেছে গুহার প্রবেশ পথের দিকে—সেখানে তিনটি পর পর খিলান। সেদিকে তাকিয়ে থাকত জীমূত, বড় ভাল লাগত তার। মাথা ন্যাড়া, গেরুয়া পোষাক ভিক্ষুরা সেই পথে চলাফেরা করতেন, কেউ বা গুহার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে ধ্যান করতেন, কেউ মৃদু স্বরে মন্ত্র পাঠ করতেন। কখনো কখনো জীমূত শুনতে পেত তাঁরা বলছেন "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

উপাসকদের মধ্যে এক বৃদ্ধ ভিক্ষু প্রায়ই জীমূতকে আদর করতেন, আশীর্ব্বাদ করতেন, জীমূতের খুব ইচ্ছে করত এই সব কিছুর মানে বোঝার। ঐ মস্ত অন্ধকার ঘর, তার ভেতরে আধখানা গোল স্তূপ, ঐ লম্বা থাম



আর গাছ লতা, মানুষ জীবজন্তুর ছবি—এ সবের মানে কি ? বৃদ্ধ ভিক্ষু মধুসূদন যখন তাকে আশীর্ব্বাদ করতেন তখন জীমূতের খুব ইচ্ছে হত সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি সেখান থেকে চলে যেতেন।

অশোকের রাজত্বের পর তখন প্রায় চারশো বছর কেটে গেছে। তাঁর দূতেরা বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিটি কোণে ভগবান বুদ্ধের বাণী পৌঁছে দিয়েছে, এমনকি মিত্র রাজাদের কাছেও। সব জায়গাই বৌদ্ধ বিহার গড়ে উঠেছে।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পাহাড় ও গুহা কেটে বিহার ও সংঘারাম তৈরি করতে শুরু করেছেন।

চৈত্য বা উপাসনা গৃহটি ঘিরে এই সব মঠ গড়ে উঠত, চৈত্যের মাঝখানে থাকত স্তূপ, তার নীচে বুদ্ধের দেহাস্থি বা কোন স্মরণ-চিহ্ন পোঁতা থাকত। দাক্ষিণাত্যে যতগুলি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠ ছিল, কার্লা তার একটি।

পাহাড়ের ধারে এই সব মঠে

লোকেরা উপাসনা করতে যেত, ভিক্ষুরা বাস করতেন এবং ছাত্রদের বুদ্ধের বাণী পড়ান হত। এই ভাবেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়ে আসছিল। তরুণ ভিক্ষুরা ধর্মচর্চা করতেন, তাঁদের এক এক দলের পড়াশুনো দেখাশোনা করতেন একজন প্রধান ভিক্ষু বা থের। যেসব বড় বড় ঘরে সকলে আলোচনা করার জন্য জড় হতেন, তার নাম ছিল বিহার। এখানে প্রবীণ ভিক্ষুরা ধর্ম ও দর্শন নিয়ে বিচার করতেন। তা শুনতে মঠবাসীরা ও বাইরের লোকে সমবেত হত।

এই ভাবে পাহাড়ের উপরের মঠগুলি নীচে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। ধার্মিক প্রকৃতির গ্রামবাসীরা প্রায়ই উপাসনা করতে যেত। উৎসবের দিনে মঠ আলোর মালায় সাজান হত। তখন সারা দিন আর সারা রাত লোক আনাগোনার বিরাম থাকত না। সকলেই কিছু না কিছু অর্ঘ্য নিয়ে যেত।

জীমূতের সারা দিন একা একা কাটত। বন্ধু বলতে ঐ পাহাড়ের পাথর-গুলো। কারণ একে তো ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য কেউ তার কাকা-কাকির কাছে ঘেঁষত না, আর সে বেচারা তো ভোর না হতেই ছাগল নিয়ে বেরিয়ে পড়ত, কাজেই বন্ধু আর কোথায় পাবে।

একদিন সন্ধ্যেবেলা যখন তার কাকা কুঁড়ের বাইরে বসে কয়েকজন গ্রামের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা কইছে তখন জীমূত জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকা, ঐ পাহাড়ের উপর পাথরের বাড়ীতে হলদে পোষাক পরা পূজারীরা থাকে, ওরা কারা?"

"ওরা সব ভিখিরী", কাকা বিরক্ত হয়ে বলল, "কাজ নেই, কর্ম নেই, কেবল ভিক্ষে করে খাবার জোগাড় করে বেড়ায়।"

এই শুনে গ্রামের এক বুড়োসুড়ো লোক বললেন, "না, না ভিক্ষুরা ভিখিরী হতে যাবে কেন?"

ওরা অভাবে থাকে, তবু কখনো খাবার চায় না। একটি তরুণ ভিক্ষু রোজ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গ্রামে ঘুরে যান ঠিকই, কিন্তু তিনি তো কখনো কারো কাছে কিছু মুখ ফুটে চান না। ধার্মিক লোকেরা নিজে থেকেই তাঁকে কিছু খাবার দেয়, খুশি হয়েই দেয়।"

কালহা তবু মানতে চায় না। "ওদের ভাঁড়ারে তেল আর ফসলের কিছু কমতি নেই।" সে বলে।

"সে কথা ঠিক।" বুড়োটি বলেন, "রাজা আর মহৎ লোকেরা এদের গ্রাম দান করেছেন। সেই সব গ্রামে যা উৎপন্ন হয় তা ঐ সব মঠেই যায়। তাছাড়াও লোকে কত দান করেছেন, কেউ মঠের থাম তৈরি করিয়ে দিয়েছেন, কেউ খিলান, কেউ বা অন্য কোন অংশ।"

"ভিক্ষুরা লোক বড় ভালো, তাঁরা রোগীর সেবা করেন, তাদের জন্য ওষুধের গাছ গাছড়া নিজেদের বাগান থেকে তুলে আনেন," আর একজন গ্রামবাসী বলে।

"আমার গরু যেদিন হারিয়ে যায় ওঁরাই তো খুঁজে দিলেন" আর একজন বলে ওঠে।

"কয়েক বছর আগে আকালের সময় ওঁরাই তো ফসল দিয়ে কত লোককে বাঁচালেন।"



"তাই নাকি? তা অন্য সময়ে ওঁদের ভাঁড়ারের ফসলগুলো কি হয় শুনি?" কালহা যেন ওঁদের উদারতায় বড়ই বিরক্ত।

"অন্য সময় ঐ ফসল থেকে ভিক্ষুরা নিজেরা খান, তাঁদের অতিথিদের খাওয়ান। কত লোক আসে, কত তীর্থযাত্রী, কত পথিক। ছাত্ররা আসে ওঁদের কাছ থেকে কত কি শিখতে।" বুড়োটি আবার বুঝিয়ে বললেন, "ভিক্ষুরা পরের উপকার করেন, তাই লোকে তাঁদের প্রয়োজন মেটাবার জিনিষপত্র দেয়। তবে ওঁদের প্রয়োজন তো খুবই অল্প।"

"তা ওঁদের ঐ মস্ত পাথরের বাড়ীতে যেসব কারুকার্য করা মূর্তি আছে, তাঁরা তো যথেষ্ট সাজগোজ করেছেন", কালহা তবু গজগজ করে।

এবারে যে লোকটি জবাব দেয় তার কাজ পাথর কাটা। সে বলে, "বাঃ, চৈত্যের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের একগাছি চুল আছে যে, চৈত্যকে তো সুন্দর করতেই হবে।"

"বাইরে দামী দামী সাজসজ্জায় শোভিত যেসব মূর্তি আছে, সুন্দর করে বাঁধা চুল—সেগুলো সব দাতাদের, কিম্বা দাতাদের মা-বাবার মূর্তি। ভিক্ষুরা নিজেরা তো সাদাসিদে হলদে কাপড় পরেন, মাথা ন্যাড়া, পাহাড়ের এ পাশে সারি সারি খুপরী দেখেছ, তার মধ্যে ওঁরা ঘুমোন। এক একজনের জন্য একটা খুপরী, কোনো কোনোটাতে দু'জন থাকেন—গুরু আর শিষ্য। যেমন সাদাসিদে ওঁদের পোষাক তেমনি ওঁদের শোবার খুপরীগুলো। তাছাড়া আরো শোবার ঘর আছে যেগুলোতে একসঙ্গে অনেকে ঘুমোন—অতিথিরা অথবা কমবয়সী ভিক্ষুরা, পাথর কেটে তাঁদের বিছানা তৈরি হয়েছে, বালিসটা পর্যন্ত পাথরের।"

জীমূত এদের কথা মন দিয়ে শুনছিল। এমন সময় তার কাকি ভেতর থেকে ডেকে বললে, "একে তো কুঁড়ের বাদশা, সারাদিন শুধু খেলা, তার ওপর আবার বসে বসে বড়দের কথা গেলা! কাল সকালে ঘুম ভাঙবে না, ছাগল চরাতে যেতে বেলা হবে, ওঠ শিগগির।" জীমূত বেচারা চোরের মত উঠে যেতে গিয়ে কাকির কাছে এক চড় খেল।

এমনি করে দিন কাটে। রোজ জীমূত ছাগল চরাতে পাহাড়ে যায়,



মঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় ভাবে ভিক্ষুদের সঙ্গে কথা কইলে হয়, কিন্তু কিছুতেই আর সুযোগ হয় না।

একদিন সকালে ওর ছাগল চরাতে একটু বেলা হয়ে গেল। কাকার অসুখ, তাঁর দেখাশোনা করতে গিয়ে দেরি। কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই জীমূত দেখে লম্বা চেহারার কমবয়সী এক ভিক্ষু পাত্র হাতে আসছেন। তিনি মুখে কিছুই বলছেন না, কিন্তু কেউ তাঁর পাত্রে কিছু দিলে তিনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

ইনি হলেন ভিক্ষু আনন্দ। ত্রিরশ্মি (নাসিক) মঠ থেকে এসেছেন কার্লায় পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে।

তিনি নীরবে ভিক্ষাপাত্রটি বাড়িয়ে ধরেছেন, গ্রামবাসীরা যার যা সাধ্য দিচ্ছে। মেয়েরা কেউ দিচ্ছে ভাত, কেউ দিচ্ছে পাতার ঠোঙায় করে দই। জীমূতের কাছে একটি কালো মোটা বাজরি রুটি ছাড়া আর কিছুই নেই। এই তার সারাদিনের খাবার। তবু তার কিছু দান করতে ইচ্ছে হল,

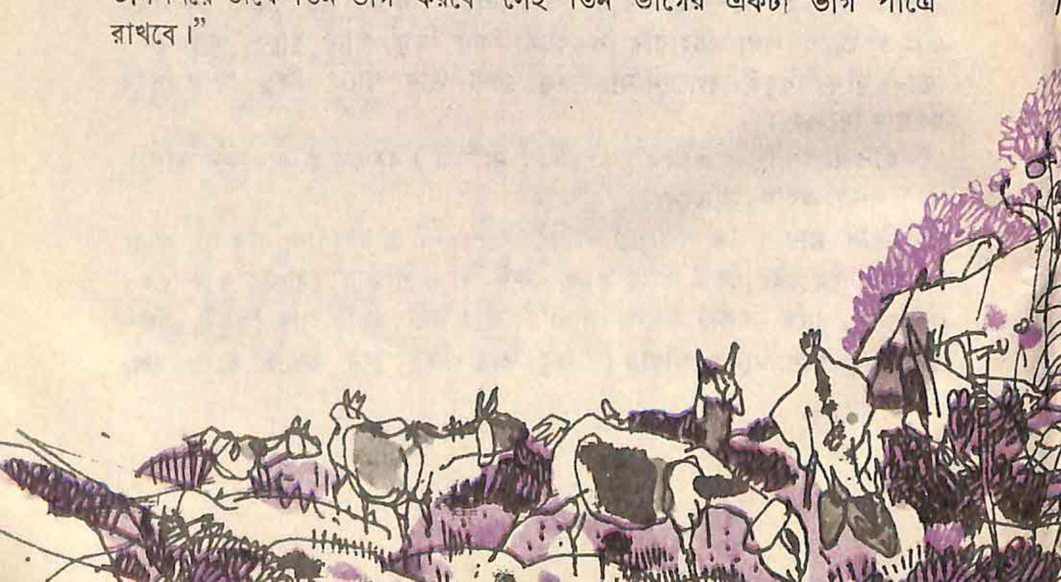
সে তার রুটির আধখানা ছিঁড়ে ভিক্ষুর পাত্রে দিল, তিনি মৃদু হেসে তাকে ধন্যবাদ দিলেন।

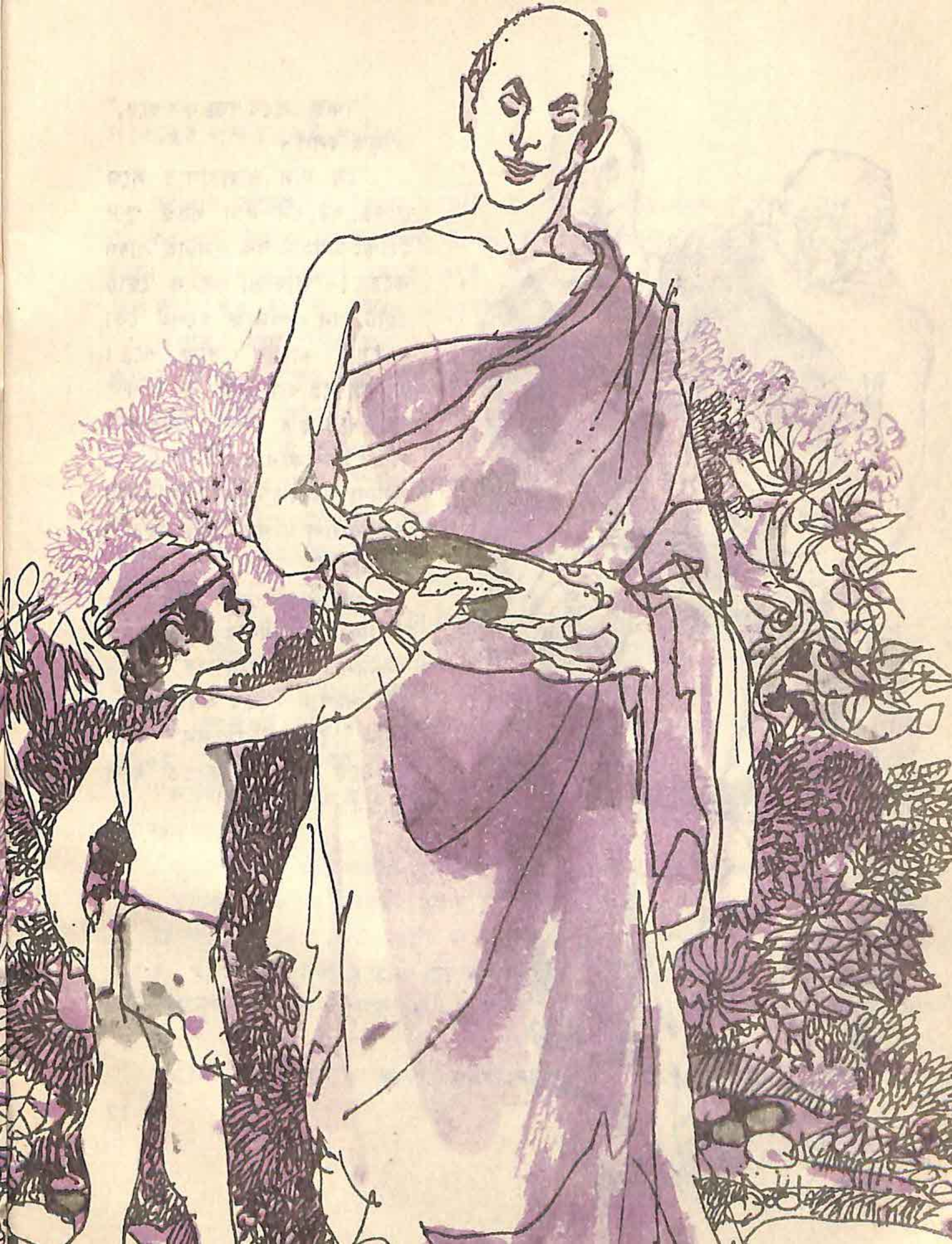
জীমূতের ইচ্ছে হল সে তার প্রত্যেক দিনের খাবারের কিছুটা অংশ ভিক্ষুদের দেয়। তাই সে বলল, "ভিক্ষাপাত্রে আমি রোজই কিছু দিতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আমাকে খুব ভোরে বেরোতে হয়। থামের পাশে যদি একটা পাত্র রেখে দেন তাহলে আমি রোজ যাবার পথে সেখানে কিছু রেখে যেতে পারি।"

এই ছেলেটির যৎসামান্য খাবার থেকে নিতে ভিক্ষুর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু তিনি তাকে নিরাশ করতেও চাইলেন না, তাই তিনি বললেন, "আচ্ছা, আমি ভিক্ষু মধুসূদনকে জিজ্ঞেস করে দেখি।"

বৃদ্ধ ভিক্ষু সব শুনে বললেন, "ছেলেটির দানের বাসনাকে আমরা দমন করতে পারি না, দেখি কি করা যায়।"

কয়েকদিন পরে একদিন সকালে জীমূত দেখে দুজন ভিক্ষু তার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ ভিক্ষু গম্ভীর মুখে বললেন, "তুমি আমাদের সাহায্য করতে চাও শুনে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। সাতদিন অন্তর তুমি দেখবে এখানে ভিক্ষাপাত্র রাখা আছে। কারণ সেদিন আমাদের অতিথিরা আসেন, তাই খাবারের বেশি দরকার হয়। তোমার খাবারটা কেমন ভাবে ভাগ করবে বলি শোনো। রুটিটা দু আধখানা করবে। তার একটা ভাগ নিয়ে তাকে তিন ভাগ করবে—সেই তিন ভাগের একটা ভাগ পাত্রে রাখবে।"







"কিন্তু সে যে বড্ড কম হবে," জীমূত বলল।

"যে দান ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া হয়, সে দান যতই ক্ষুদ্র হোক, ভগবান বুদ্ধ সেটাই গ্রহণ করেন। তাছাড়া অনেক ছোট ছোট দান একসঙ্গে হলেই তো সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বেড়ে ওঠে। এই পাথরে বাড়িটাই দেখ। কত বছর ধরে কত লোক, কত ধনী দরিদ্র দান করেছেন, তবেই না আমরা ভগবান বুদ্ধের উপাসনার এই বিশাল মন্দির তৈরি করতে পেরেছি!"

বৃদ্ধ ভিক্ষু সস্নেহে হাসলেন। "আচ্ছা, তুমি এবার যেতে পার। একদিন ভিক্ষু আনন্দের কাছে তুমি ভগবান বুদ্ধের কথা শুনো। তিনি কেমন ছিলেন আর মানুষকে কি কি করতে বলে গেছেন।"

তারপর কয়েকদিন ভিক্ষুরা ছোট ছেলেটিকে আর দেখতে পান না। গ্রামের এক বৃদ্ধার কাছে ভিক্ষু আনন্দ শুনলেন জীমূতের নাকি খুব জ্বর। তিনি কিছু গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ করে জীমূতকে দেখতে গেলেন। দিন সাতেকের মধ্যেই জীমূত একেবারে সেরে উঠল।

অসুখের মধ্যে ভিক্ষু আনন্দের সঙ্গে জীমূতের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। জীমূত তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলত।

চৈত্য গুহায় ঢোকার মুখেই এক বিরাট থাম। তার মাথায় চারটে মস্ত জন্তুর মূর্তি। "ঐ জন্তুগুলো কি?" জীমূত জানতে চাইল।

ভিক্ষু আনন্দ বললেন, "ওগুলোকে বলে সিংহ। উত্তরে দেখা যায় ওদের। অনেক সময় উঁচু স্তম্ভের মাথায় সিংহ মূর্তি খোদিত করা হয়। এই যে স্তম্ভটা দেখছ এর তলায় দাতার নাম লেখা আছে 'মহাঋথি গতির পুত্র অগ্নিমিত্তানক'।"

"উনি কি এখানে এসে এটা তৈরি করিয়েছিলেন?" আনন্দ হাসলেন। "ন, তা ঠিক নয়। স্তম্ভটা তৈরি করে পাথরের মিস্ত্রিরা যারা এইসব কাজে দক্ষ। তারাই গুহার সবটা তৈরি করেছে, যদিও এর জন্যে অর্থ সাহায্য করেছেন রাজারা, বণিকরা, এমনকি চাষা, যারা বেত বোনে, যারা হাতের কাজ করে তারা সবাই।"

"আমিও কি এই কাজ করতে পারি?" জীমূত একটু লজ্জিত ভাবে জিজ্ঞেস করে।

"কারিগরদের এক একটা গোষ্ঠি থাকে। খুব ভাল হাতের কাজ না হলে তাকে গোষ্ঠিতে নেওয়া হয় না।"

স্তম্ভের পিছনে একটি নারী ও একজন পুরুষের মূতি খোদাই করা। "এঁরা হলেন দেবপাল ও তাঁর স্ত্রী ক্ষমা। এঁরা থাকেন কার্যাকে। তাঁরা মঠে অনেক জমি দান করেছেন। তাই তাঁদের স্মরণে এই মূর্তি খোদিত হয়েছে।"

"এইসব জমি থেকে আমরা ফসল পাই। তাই দিয়ে আমাদের চলে

এবং অতিথিদেরও খাওয়ানো হয়। একজন ভিক্ষুর অতি সাধারণ খাবার আর একটি হলদে কাপড় ছাড়া আর কিছুই লাগে না। দাতারা দয়া করে আমাদের প্রয়োজন মেটাবার ভার নিয়েছেন, যাতে শিক্ষা ও ধর্মের জন্য আমরা আমাদের সমস্ত সময়টা ব্যয় করতে পারি। কখনো ফসল বিক্রী করে আমরা মঠের প্রদীপের জন্য তেল কিনি।

"এবারে এসো, বাঁ দিক থেকে পঞ্চম স্তম্ভটা দেখবে। এখানে লেখা আছে, 'এই স্তম্ভ ধেনুকাকটের ধম্ম যবনের দান।' তৃতীয় স্তম্ভটা এবং আরো অনেক স্তম্ভ বিদেশের যবনেরা দান করেছেন।"

ভিক্ষু মধুসূদন বললেন "এই যে খিলান দেখছো এটা যে বোধিবৃক্ষের নীচে বসে বুদ্ধ মহাজ্ঞান লাভ করেন সেই অশ্বত্থ গাছের স্মৃতিতে করা। এই গুহায় যারা প্রবেশ করবে তারা যেন প্রকৃত সত্য ও জ্ঞানের অন্বেষণে আসে। যদি ভেতরে ঢোকার সময় তোমার না থাকে, তাহলে এই অশ্বত্থ খিলানের নীচে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি কর 'ওম মণিপদ্ম ওম, পদ্মাসনে বুদ্ধ'। তাহলে বুদ্ধ তোমার মনে শান্তি দেবেন। দুঃখে, বিপদে এই শান্তি সব সময় তোমার সহায় হবে, তোমার কষ্ট দূর হবে অথবা সহনীয় হয়ে উঠবে।"

ভিক্ষু আনন্দ জীমূতকে বললেন সম্রাট অশোকের কথা। যুদ্ধে জয়ী হয়েও যিনি যুদ্ধের ভয়াবহ ও করুণ দৃশ্যে ব্যথিত হয়ে বিজিত রাজ্য ছেড়ে দেন। অশোকই বুদ্ধের বাণী দূর-দূরান্তরে প্রচার করেন। এই ভাবে বুদ্ধের বাণী মধ্য ভারতে প্রচারিত হয়।

ভিক্ষু আনন্দ বললেন পশ্চিম ভারতের আরো সব চৈত্য গুহার কথা, যেমন কার্লার কাছেই আছে ভোজ ও নাসিকের মঠ। ভিক্ষু জীমূতকে আরো বললেন, বুদ্ধের প্রভাব এমন ভাবে ছড়িয়েছে যে অন্য ধর্মের রাজারাও সকলেই কাষায়ধারী ভিক্ষুদের সাহায্য ও শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। তিনি বললেন বিদেশী রাজা উষভদত্তের কথা। তিনি শক সত্রপ, নাফনের জামাই। নাসিক ও কার্লাতে পাওয়া স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের অনেক কিছু দান করতেন, একবার ব্রাহ্মণদের তিনি গোদান করেছিলেন; আর 800 নারকেল গাছের এক বাগান দান করেছিলেন নাসিকের বৌদ্ধ



গুহার ভরণপোষণের জন্য। শক ক্ষত্রপদের পরে এসেছিলেন শতকনী বংশ। নাসিক ও কার্লার স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় যে তাঁরাও পূর্বতন রাজাদের দানের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন এবং নিজেরাও আরো দান করেছিলেন।

দরজার ঠিক উপরে লেখা আছে রাজা গোতমীপুত্র করাযক নামে গ্রামটি দানের সমর্থন করছেন। এই গ্রাম পূর্ববর্তী কোন রাজা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শুধু রাজা রাজড়া নয়, সাধারণ দরিদ্র লোকেরাও ভিক্ষুদের কিছু না কিছু দিতে চেয়েছেন। আনন্দ খিলানের নীচে একটি পাথরে চৌকাঠ দেখালেন। ভিক্ষুনী অসাধমিতার দান এটি—সম্ভবত অনেক দরিদ্র ব্যক্তির দান সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

ভূতপালার স্তম্ভলিপিতে এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কথা আছে, তিনি প্রবেশ দ্বারের দুদিকে পাঁচতলা উঁচু কারুকার্যখচিত জাফরি করিয়ে দিয়েছিলেন। যেসব যবন বণিকেরা পশ্চিমের দূর দূর দেশ থেকে জাহাজে করে আসত তাদের কথা শুনে জীমূত খুব অবাক হল। ভিক্ষু আনন্দ বললেন অনেক দিন আগে সেকেন্দর নামে এক তরুণ দিগ্‌বিজয়ীর সঙ্গে তারা স্থলপথে এসেছিল। তবে পরে তারা ফিরে যায়। এখন অবশ্য তারা আসে বাণিজ্য করতে, তারা বুদ্ধের বাণী শুনতে খুব ভালবাসে।

দাতাদের মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন ধেনুকাকট থেকে। জীমূত গুণে দেখল, সবশুদ্ধ চৌদ্দ জন। এঁদের মধ্যে যবনরাও ছিলেন, আর ছিলেন সুগন্ধি ব্যবসায়ী সিংহদত্ত, কাঠের কারিগর সামিনা। সত্যি কত লোকে ভগবান বুদ্ধকে আর তাঁর ভিক্ষুদের ভালবাসে ভাবলেও আশ্চর্য হতে হয়।

একদিন সন্ধেবেলা জীমূত সব ছাগলগুলো জড় করে দেখে একটা কম হচ্ছে। কালো মদ্দা ছাগল একটা। তাকে না পাওয়া গেলে কাকা তো আর আস্ত রাখবেন না।

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। জীমূত ভাবল এখন ছাগলের পাল নিয়ে বাড়ি ফিরি—তারপর পরে নাহয় হারানো ছাগলটা খুঁজতে বেরোব।

ফেরার পথে ওর সঙ্গে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর দেখা। "তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, শুনছি চিতাবাঘ বেরিয়েছে।" তিনি বললেন।

জীমূত তখন এতই মনমরা যে সে ভাবল চিতাবাঘ থাকলেই বা কি। আমাকে তো ছাগল খুঁজতে বেরোতেই হবে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর সে চুপচাপ বেরিয়ে এসে পাহাড়ের দিকে চলল।



ভয়ে ক্লান্তিতে বেচারি কেঁদে ফেলেছে, তবু সে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল। তখন তার মনে হল ভিক্ষু মধুসূদনের কথা। তিনি বলেছিলেন বিপদে পড়লে 'পদ্মাসনে বুদ্ধ' মন্ত্র উচ্চারণ কোর। জীমূতের মন থেকে তৎক্ষণাৎ সব ভয় দূর হয়ে গেল।

আরো উঁচুতে উঠতে লাগল সে। অবশেষে যেন দূর থেকে সে ব্যা ব্যা ডাক শুনতে পেল। একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল ছাগলটা।

তাকে চিনতে পেরে ছাগলটা আনন্দে ডেকে উঠল। হঠাৎ তার ডাকের সুর বদলে গেল। মনে হল ছাগলটা ভয় পেয়েছে। জীমূত ঘুরে তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে দুটো সবুজ চোখ জ্বলজ্বল করছে। ছায়ার মত কি যেন একটা গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এল। সর্বনাশ! চিতাবাঘ!

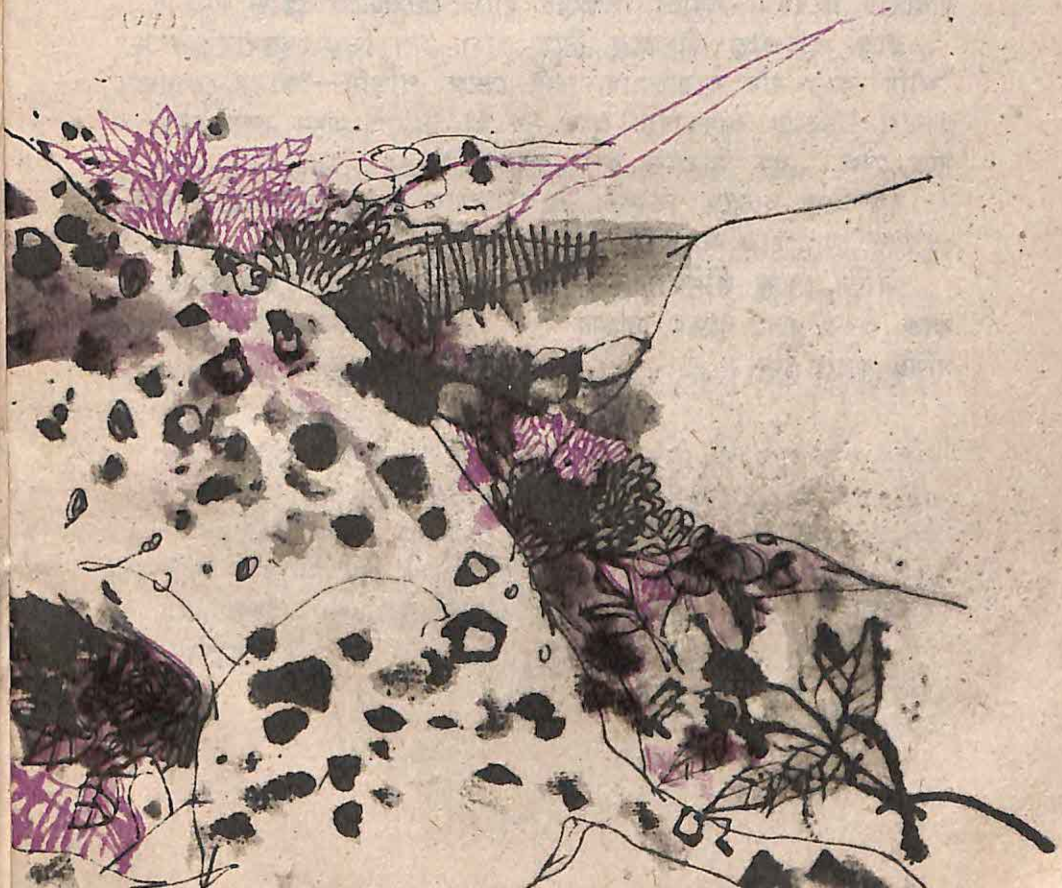


বাঘটাকে তাড়াবার জন্যে হাতের পাঁচন ঘুরিয়ে জীমূত চীৎকার করতে লাগল।

তারপরে যে ঠিক কি হল বেচারা বুঝতেই পারল না। সম্ভবত চিতাটা ছাগলের দিকে লাফ মেরেছিল কিন্তু আন্দাজ ঠিক করতে না পেরে নীচের পাথুরে জমিতে গড়িয়ে পড়ল। ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছাগলটা পাথর থেকে পড়ে গেল। চিতার ধাক্কায় জীমূতও গড়িয়ে পড়েছিল। বাঘের মুখটা তার একেবারে মুখের উপর।

তার গরম নিঃশ্বাস জীমূতের মুখে লেগেছে।

জীমূত বিড়বিড় করে আওড়াতে লাগল "ওম্ মনিপদ্ম ওম্, পদ্মাসনে বুদ্ধ।" হঠাৎ চিতাটা কেমন দুমড়ে মুচড়ে শক্ত হয়ে গেল। পাথরের



ধাক্কায় পিঠ ভেঙ্গে মারা গেল চিতাটা। পরিশ্রমে ক্লান্ত জীমূত চিতাটার গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, ছাগলটা আঁকড়ে ধরা।

আকাশের রঙ ক্রমে ফিকে হয়ে এল, দু-একটা ভোরের পাখি ঘুমের মধ্যে কিচিমিচি শুরু করেছে, এমন সময় জীমূতের ঘুম ভাঙ্গল।

ছাগলটার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল, জীমূত তাকে কোলে তুলে বাড়ি ফিরে চলল। গ্রামের বাইরেই তার কাকার সঙ্গে দেখা, দলবল নিয়ে তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। একজন জীমূতের কাছ থেকে ছাগলটা তুলে নিল। "এ কি করেছিস! আমার সবচেয়ে ভালো ছাগলটার পা ভেঙ্গেছে।" কালহা রাগের চোটে লাঠি তুলে জীমূতকে মারতে তাড়া করল।

একজন গ্রামবাসী তাকে থামাল। "যথেষ্ট হয়েছে, ছেলেটাকে অনেক মারধোর করেছ। এবারে ভিক্ষুদের হাতে ছেলেটাকে ছেড়ে দাও।"

ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত জীমূতকে নিয়ে তারা গেল ভিক্ষু মধুসূদনের কাছে। "আমি বুদ্ধর নাম করেছিলাম, তাই ভেঙ্গে পড়িনি—"জীমূত কোনমতে জানাল "চিতাটা কামড়াবার জন্যে মুখ হাঁ করেছে এমন সময় হঠাৎ ও মরে গেল। বুদ্ধ আমাকে কৃপা করলেন।"

বৃদ্ধ ভিক্ষু সস্নেহে বললেন, "বুদ্ধের দয়ার কথা তুমি আরো জানবে। তোমার যোগ্যতাও আছে।"

সেদিন থেকে জীমূত ভিক্ষুদের কাছেই থেকে গেল। সে তাঁদের হয়ে কাজ করত এবং বুদ্ধের জ্ঞানের কথা শিখত। এইভাবে তার জীবনের গতিই বদলে গেল!

পথচারীর অনেক কিছু দেখে এসে

দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়। কুশানদের রাজত্বে কয়েক শো বছরের হারনো মথুরা শহর বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। কারিগরদে.. পাড়ায় ছোট ছোট ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ি, সরু গলি কাজকর্মে গমগম করছে।

এইরকম সময়ে এক রোদ-ঝলমল দিনের শেষে কুঁড়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কেতকী পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঐ একটা ঘরের মধ্যেই কাজকর্ম, শোয়া থাকা সব। ঘরের মধ্যে কেতকীর বৃদ্ধ শ্বশুর একটা লাল বেলে পাথরের কাজ করা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কেতকীর স্বামী বাড়ি ফিরবেন। আরো সব কারিগরদের সঙ্গে তিনি সারা দিন লাল, গোলাপী, ছিটছিট বেলে পাথরের ছোট বড় নানারকম মূর্তি খোদাই করেন।

স্বামী বাড়ি ফিরেই কেতকীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধমকে উঠলেন, “এখনো সেই অপদার্থ ছেলেটার আশা করো। কাল হয়ত মন্দিরে যাবে ওর ফেরার জন্যে পূজা দিতে।”

“যেমন তোমার জন্যে, তোমার বাবার জন্যে আর তোমার ছেলেদের জন্যে পুজো দিই তেমনি তার জন্যেও দেব—তার ভালোর জন্যে আর তার ফিরে আসার জন্যে।”

‘আমার অন্য ছেলেরা সব কাজের ছেলে। তারা খাদে কিম্বা কারিগদের কারখানায় কাজ করে।’

কেতকী থালায় করে ভাত নিয়ে এল, ছোট ছোট মাটি আর হাল্কা ধাতুর বাসনে দই আর কুমড়োর তরকারি। বুড়ো শ্বশুর মাথা নেড়ে বললেন, “হ্যাঁ ওরা সব বড় ভাল ছেলে। কিন্তু কি জানো? মরীচির মধ্যে একটা অন্যরকম কিছু ছিল। আমার মনে আছে—মাত্র ন’বছর বয়সে ও বাঁদরের হাড় দিয়ে কি সুন্দর একটা খেলনা বানিয়েছিল। কত রকম প্রশ্ন করত—চোখ চকচক করত কৌতুহলে।”

"হ্যাঃ কৌতূহল!" মরীচির বাবা হেসে উড়িয়ে দেন, "ঐ মালির মেয়েটার সঙ্গে অত কি রাতদিন কথা। আর আমার কাছে মার খেয়েই কিনা ঘোড়ার কারবারী ঐ শকটার সঙ্গে পালালো। বারো বছর হয়ে গেল। কে জানে কোথায় আছে এখন।"

একটু রাত হতেই সারা পাড়া নিঝুম হয়ে গেল। কার ঘরে কত তেল আছে যে বাতি জ্বালাবে!

পরের দিন পথের ধারের মন্দিরে গেল কেতকী। সঙ্গে পাড়ারই একটি ছিপ্ছিপে ছেলেমানুষ মেয়ে। মরীচি ফিরলে এরই সঙ্গে তার বিয়ে দেব বলে ঠিক করেছিল কেতকী।

ইতিমধ্যে একদল লোক ঘোড়ায় টানা গাড়ি করে মথুরার দিকে এগোচ্ছিল। আরোহীদের মধ্যে একজন অধৈর্য হয়ে এগিয়ে চলেছিল। সত্যি মথুরার মত এমন নিম আর কদম গাছ আর কোন দেশে আছে? কোথায়ই বা এমন সবুজ টিয়ার ঝাঁক?

মাকে হঠাৎ দেখতে পেল সে—আগের মতই সোজা—একটুও ঝুঁকে পড়েনি। কেতকীও ঠিক তখনই তাকে দেখতে পেয়েছে।

''চিনতে পেরেছ?" প্রশ্ন করল ছেলেটি।

"পারব না? চল, চল এখন বাড়ি চল।"

"বাবা যদি আমাকে বার করে দেয়?" মরীচি বলল।

"তোর বাবা মুখে যাই বলুন আসলে তিনিও তোর জন্যে ছটফট করছিলেন"। কেতকী সঙ্গের মেয়েটির দিকে ফিরে বলল "তুই বাড়ি যা এবার, তোকে একেবারে যখন বৌ করে ঘরে আনব তখন আসবি।"

উঠোনের কুঁয়োতে গিয়ে হাত পা ধুয়ে নিল মরীচি। কুঁয়ো ঘিরে কুঁড়ে ঘরগুলো। মা ছেলেতে কত কথা।

কেতকী ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই মরীচির বাবার মুখ খুশিতে ঝক্মক্ করে উঠল। "তাহলে তুমি ফিরলে এতদিনে" ভারী গলায় বললেন তিনি।

কেতকী চটপট করে খাবার বেড়ে দিল। চুপচাপ খেতে লাগল সকলে।

খাওয়া যখন প্রায় হয়ে এসেছে বাবা জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে, "এখন তাহলে কি করবে ঠিক করেছ?"



"কুশলী কারিগরের কি কখনো কাজের অভাব হয়? মথুরায় হোক, অন্য কোথাও হোক কাজ একটা জুটে যাবেই।" মরীচি শান্তভাবে উত্তর দেয়।

"ঐ জোচ্চোর আর মিথ্যুক শক বন্ধুরা কি কাজ শিখিয়েছে তোমায়? কোন ঘোড়ার কারবারীকে কে কবে ভাল লোক হতে দেখেছে?"

"রাজা আর অমাত্যেরা শক প্রহরী রাখেন, সহিসের কাজও দেন। মথুরার কারিগরেরাও তো শক সৈন্যদের মূর্তি গড়েছে —চওড়া মুখ, ভারি তলোয়ার, উত্তর দেশী মোটা জামাকাপড় আর অশ্বারোহীদের শক্ত জুতো পরা।

শকরা যে আমাদের দেশে রাজত্ব করেছে তাও তো তুমি জানো। আমাদের এখনকার কুষাণ রাজাদের সঙ্গে শকদের চেহারার অনেক মিল আছে।" "রাজা যদি বেশি কর না বসান আর তাঁর সৈন্যরা আমাদের উপর



অত্যাচার না করে তাহলেই আমি খুশি। কে রাজত্ব করেছে খোঁজ রেখে কি দরকার। তবে তামার কথা হল যে মথুরার কারিগর কেন শক ব্যবসায়ীদের দলে ভিড়বে?"

"পথের সঙ্গী হিসেবে তো তারা ভালোই, কেননা তাদের ঘোড়ার লাথির ভয়ে কেউ তাদের কাছে ঘেঁষে না। তবে আমি বেশিদিন ঘোড়ার কারবারীদের সঙ্গে ছিলাম না। ওদের ছেড়ে আমি বণিকদের দলে ভিড়লাম। ওরা এক সঙ্গে অনেকে মিলে পথ চলে—একজন অভিজ্ঞ দলপতি থাকে, সঙ্গে সশস্ত্র প্রহরীও থাকে অনেক সময়।

"কতো দেশের কথা, সেখানকার সব জিনিসপত্রের গল্প তাদের কাছে শোনা যায়। উত্তর থেকে আসে নরম ছাগলের লোমে তৈরি পশমী কাপড়। উটের কাফিলা আসে মরুভূমি আর পাহাড় পেরিয়ে। চীন থেকে তারা আনে চীনাংশুক, কি সূক্ষ্ম সে কাপড়। পশ্চিমের দূর দূর দেশে তার কদর



কত। যবনদের দেশ থেকে তারা আমাদের ধনী শ্রেষ্ঠীদের জন্যে আনে সুরা আর প্রবালের হার।"

দাদু বাধা দিয়ে বললেন, "তুই যেসব দেশে গিয়েছিলি সেখানে আমাদের দেশে তৈরি কোনো জিনিস দেখলি?"

"অনেক, অনেক।" মরীচি উত্তর দেয়, "যবনরা যা আনে তার থেকে ঢের বেশি নিয়ে যায় কতরকম সুন্দর রঙিন কাপড়, মিহি সূতী থেকে আরম্ভ করে কারুকার্য করা কিংখাব, মণিমুক্তো, গয়না, সুগন্ধি, ওষুধপত্র, রঙ, দারচিনি, গোলমরিচ, হাতীর দাঁত ও সেই দাঁতের অপূর্ব সব কাজ। কাপিসায় (কাবুলে উত্তরে) কুষাণ রাজাদের গ্রীষ্মনিবাস। আমি সেখানে মথুরার তৈরি গজদন্তের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ দেখেছি।

"স্থাপত্য যা দেখেছি তার প্রায় সবই মথুরার পাথরের। কাবুল নদী থেকে আরম্ভ করে আমাদের যমুনা অবধি সর্বত্রই দেখলাম শান্তি বিরাজ করছে—ধনসম্পদ, ব্যবসা বাণিজ্য আর কারুশিল্পের উন্নতি সর্বত্রই দেখলাম। এখন আমাদের দলের লোকদের কাছে সরাইয়ে ফিরে যেতে হবে। দু'একটা কাজ করার মত পাথরের টুকরো হবে নাকি? ভাঙ্গা পাথর কিম্বা বাঁদরের হাড়?"

"বাঁদরে হাড় এখানে সস্তা। তাছাড়া আমাদের সামান্য খুঁত ধরা একটা পাথর আছে, তাও দিতে পারি।" মরীচির বাবা বললেন।

অন্ধকার গভীর হল। তারায় ভরা আকাশের নীচে জলের কলসীগুলোর পাশে বসে মা ছেলের কথা আর ফুরোতেই চায় না।

একদিন সন্ধেবেলা মরীচি সরাই থেকে আসার পর তার দাদু বললেন, "এবার তোমার ভ্রমণবৃত্তান্ত কিছু শোনা যাক।"

মরীচি তার কাহিনী শুরু করল, "এখন পথে ঘাটে বিপদের ভয় নেই। তাই শুধু বণিক কেন, সাধু, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু রআ ছাত্রেরা নির্ভয়ে এদেশ থেকে ওদেশ যাওয়া আসা করছে। যারা লেখাপড়া শিখতে আসেন তারা। সবাই পণ্ডিত, এক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত বছর পড়াশোনা করে হয়ত চলেছেন আরেক বিশ্ববিদ্যালয়ে—সেখানে আরো সাত বছর পড়াশোনা করবেন। পাহাড়ের ওদিকে যে সব দেশ সেখানেও আমি গিয়েছি। ওখান থেকে শক, পহ্লবী আর কুষাণরা এসেছে, একের পর এক।"

"আচ্ছা, ওরা এদেশে আসে কেন?" দাদু জানতে চান।

"বরফে ঢাকা পাহাড়ের ওপারে যেসব দেশ আছে সেগুলো আমাদের নদীর জলে ধোয়া সমভূমির তম উর্বর নয়।" মরীচি বুঝিয়ে বলে। "হয় সে দেশে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়, ধুধু বরফ, কোনো ফসল হয় না, নাহলে কেবল ঘাস জমি যেখানে শুধু ভেড়া চরে। শীতে যখন প্রবল ঠাণ্ডা পড়ে তখন ওখানকার লোকে অন্য কোথাও আস্তনা গড়ে। শত্রুর আক্রমণের জন্যও অনেক সময় ওদের চলে আসতে হয়। এদেরই কোনো কোনো দল আমাদের দেশের মত জায়গায় এসে পড়ে—যেখানে শস্যে ভরা মাঠ আর সমৃদ্ধিশালী শহর। সমতলভূমির লোকেদের চেয়ে এইসব যাযাবররা বেশী শক্তিশালী, কিন্তু তারা আমাদের যুদ্ধে হারিয়ে দিলেও আমাদের গুণী ব্যক্তিদের সম্মান রাখতে জানে। যবন, শক, পহ্লবীরা প্রথমে পঞ্চনদের দেশে এসেছে, তারপর ক্রমে দক্ষিণ আর পূবে ছড়িয়ে পড়েছে। কুষাণরাও তাই করেছে। কুষাণ বংশের বিখ্যাত সম্রাট কনিষ্কের সবচেয়ে সেরা মূর্তিটা কিন্তু বানিয়েছে মথুরার কারিগরেরাই। পূবে চীনের সীমান্ত থেকে কুষাণরা পশ্চিমে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত চলে আসে। তারপর তারা চলে আসে দক্ষিণ দিকে। প্রথমে বলখ নদী থেকে কাবুল নদী, তারপর এক উঁচু গিরিপথ পার হয়ে পঞ্চনদের দেশে,সেখান থেকে যমুনার তীরে আমাদের এই



দেশের কেন্দ্র ভূমিতে। তাদের মূর্তি আর মুদ্রার মধ্যে ইতিহাস লেখা হচ্ছে—সেই লেখা লিখছে আমাদেরই ভাস্কর আর স্থপতিরা। রাজার মূর্তিতে দেখবে যাযাবর অশ্বারোহীদের উঁচু, পুরু, জুতো, পহ্লবীরা যেমন পরে সেই রকম মোটা জামা আর শকদের মত ছুঁচলো শিরস্ত্রাণ, মূর্ত্তির গায়ে আর মুদ্রায় তাদের উপাধি খোদিত থাকে। সেগুলো দেখলে বোঝা যায় এরা কে কোথা থেকে এসেছে। সম্রাটের উপাধি মহারাজা এবং রাজাধিরাজ। পারস্যেও পহ্লবী এবং পার্থেয় রাজারা এইরকম উপাধি ব্যবহার করেন। এছাড়াও রাজাকে দেবপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়। সুদূর চীনেও কিন্তু রাজাকে দেবপুত্র বলা হয়। এই সব উপাধিগুলোই কিন্তু সংস্কৃতে, কারণ শক আর কুষাণ রাজারা পণ্ডিতের ভাষা সংস্কৃতই ব্যবহার করেন।”



"বেদের ভাষা, বড় পবিত্র ভাষা।" দাদু নিজের মনেই বলেন, "এ ভাষা জানেন কেবল ব্রাহ্মণ আর পণ্ডিতরা।"

মরীচি আরো বলে চলে, "রাজার কর্মচারীরা, রাজকবি সকলেই এই ভাষা ব্যবহার করেন। রাজার সমস্ত ঘোষণাপত্র, আদেশ সবই সংস্কৃতে। সম্রাট কণিষ্ক নিজে ভগবান বুদ্ধের ভক্ত। তাঁকে দ্বিতীয় অশোক বলা হয়। উনি কত মঠ তৈরি করেছেন। কত জ্ঞানী গুণী, কত কবি আছেন ওঁর রাজসভায়। মথুরার কারিগরদেরও অবস্থা ফিরে গেছে। বুদ্ধের মূর্তি চাই, জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি চাই, রাজারাজড়া, শ্রেষ্ঠী অমাত্য সকলের মূর্তি চাই। ব্রাহ্মণরাও তাদের দেবমূর্তি চাইছে। মূর্তির এত চাহিদা যে কারিগররা তৈরী করে উঠতে পারছে না।"

দাহ্ বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু আমরা তো জানতাম যে যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তাঁর মূতি পূজা করা বারণ। কেবল কতকগুলি দিব্য চিহ্ন দিয়ে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ করা হবে।"

"হ্যাঁ দাহ্, আগে তাই মনে করা হত বটে। কিন্তু ঋষি নাগার্জুন, যিনি দক্ষিণাপথে এসে বাস করছেন, তিনি মনে করেন বুদ্ধের প্রতিমূর্তি না দেখলে লোকে তাঁকে কি করে পূজো করবে? কণিষ্কও তাই বিশ্বাস করেন। তক্ষশিলা, পুরুষপুর, গান্ধার—আমি যেখানে গিয়েছি সেখানেই বুদ্ধের মূতি দেখেছি, এমনকি মথুরাতেও। অশ্বঘোষ নামে এক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন। তিনিই সম্রাট কণিষ্ককে দীক্ষিত করেন। এখন বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে এবং প্রত্যেকেই যে যার মত অনুসরণ করছে। তাই সম্রাট কণিষ্ক সভা ডাকলেন। কাশ্মীর উপত্যকার কণিষ্কপুরে সেই সভা বসল। সারা দেশ থেকে পাঁচশো ভিক্ষু যোগ দিলেন। অশ্বঘোষ এবং আর একজন জ্ঞানী ভিক্ষু বসুমিত্র সেই সভা পরিচালনা করলেন। বুদ্ধের বাণীর আসল রূপটি কি এবং এখন থেকে কোন মত তাঁরা মেনে চলবেন তা তাঁরা সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করলেন। বাণীগুলি লেখা হল। তামার ফলকে সেই বাণী উৎকীর্ণ করে এক বিরাট সৌধের নীচে পুঁতে রাখা হল যাতে আজ থেকে একহাজার বছর পরেও লোকে সেটি পড়তে পারে।"

বুড়ো দাহ্ আবার বাধা দিলেন, "কিন্তু গুণীদের বাণী তো তালপাতায় বা তামার ফলকে লেখা যায় না।"

"তাহলে তাঁদের বাণী থাকবে কি করে?" মরীচি জিজ্ঞেস করল।

"কেন লোকের মুখে মুখে বংশ-পরম্পরায় চলে আসবে।" দাহ্ বললেন।

"এইভাবে তাঁদের বাণী তো বেশি দূর ছড়াতে পারবে না। তাছাড়া এখন অনেকে ভাবছেন যে লেখাটাই চিরকাল থাকে। তাহলে মত নিয়ে দলাদলিও কম হয়।"

"দলাদলি হয়েছিল নাকি?" দাহ্ জিজ্ঞেস করেন।

"হয়নি আবার?" মরীচি বলে, "দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল বৌদ্ধরা। দক্ষিণের ভিক্ষুরা বলেন বুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষ। তিনি নির্বাণ লাভ

করেন। তাঁর পথ অবলম্বন করলে যে কেউ এই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু উত্তরের ভিক্ষুরা বলছেন যে বুদ্ধ ছিলেন দেবতা, আমাদের উচিত তাঁকে পূজো করা। সম্রাট উত্তরের লোক, কাজেই উনি দ্বিতীয় মতটিকেই বিশ্বাস করেন। এই মতের নাম মহাযান। সেইজন্যই এখন বুদ্ধ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের মূর্তি তৈরির প্রচলন হয়েছে।"

মরীচি বলে চলল, "সম্রাট কণিষ্ক রাজধানী পুরুষপুরে যে বিহার তৈরি করিয়েছেন সেটা দেখবার মত। চৌদ্দ তলা উঁচু বুরুজ, তাতে লোহার মস্ত চূড়ো। তাকে ঘিরে তামার পাত, তাতে সোনার জল করা। চারপাশে বুদ্ধের মূর্তি খচিত।

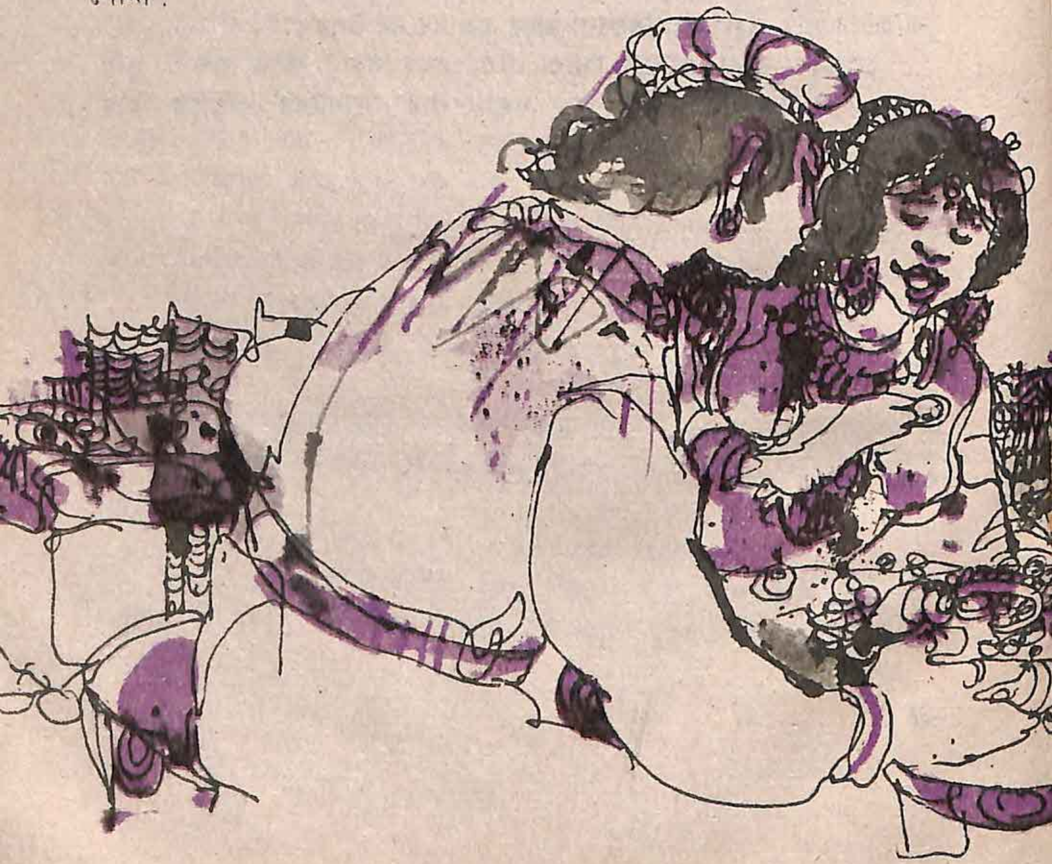
"আমরা তো এরকমভাবে বুরুজ বানাই না", মরীচির বাবা সব শুনে বললেন।

"সম্রাট অনেক সময় যবন কারিগরদের নিয়ে আসেন। এই বিহারের কাজটার ভার ছিল আগেসিলোস নামে এক যবনের উপর।"

কেতকী তাড়া লাগায়, "নাও, নাও, এখন সবাই শুতে যাও। তুমি সঙ্গে করে কি কি এনেছ কাল সন্ধ্যাবেলায় আমাদের দেখাতে হবে কিন্তু।"

পরের দিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর মরীচি বিদেশ থেকে আনা ওর সব জিনিস একে একে বার করল। মার জন্য শাঁখা, চক্‌চকে ধাতুতে তৈরী হদলে পাথর বসানো গয়না, দাদুর জন্যে কম্বল, যেমন পুরু তেমনি গরম আর তাতে কি অদ্ভুত সব নক্সাকাটা। মরীচি বলল, "এটা হচ্ছে কাশ্মিরী জিনিস। ওদের পাহাড়ী ছাগলদের লম্বা লম্বা লোম দিয়ে তৈরি। এ জিনিস দিয়ে খুব গরম পশমী কাপড়ও হয়।"

এরপর মরীচি যা বার করল তা দেখে তো সকলের দম বন্ধ হবার যোগাড়। একটা সোনার মোহর। বাবা বললেন, "আমরা তো কড়ি আর তামার পয়সাই দেখেছি, বড় জোর রূপোর টাকা। এ যে দেখছি সোনা!"



"আমি দস্যুদের হাত থেকে এক বণিকের কাফলা বাঁচাই। তাই তিনি আমাকে এটা দেন। মোহরটা দেখ বাবা। একদিকে অশ্বারোহীর পোষাকে রাজার মূর্তি, অন্য পিঠে বুদ্ধের মূর্তি, পশ্চিমের একটা অচেনা লিপিতে তাঁর নাম লেখা রয়েছে।"

মোহরটা উল্টে পাল্টে দেখে বাবা বললেন, "খাসা বানিয়েছে জিনিসটা।"

"আমি শুনেছি বহু দূরে পশ্চিমে একটা দেশ আছে (রোম), তারা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করে। এই সব রাজা ও দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা মোহর তাদের দেশ থেকে আসে। ওরা আমাদের কাছ থেকে কেনে মশলা, গন্ধদ্রব্য, মণিমানিক্য, ওষুধপত্র, চীন থেকে কেনে রেশম। স্থলপথে আর সমুদ্রপথে দুভাবেই মাল চালান যায়। ওরা মোহরে দাম দেয়, আমাদের রাজারা সেই মোহর গালিয়ে তাতে আবার ছাপ দিয়ে বাজারে চালু করেন।"

তারপরে মরীচি একটা গজদন্তের বেশ বড় গোছের টুকরো বার করল।



বাবা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এ তুমি কি করে কিনলে? কারিগরদের পক্ষে তো এই জিনিস সংগ্রহ করা সহজ নয়!"

"যাদের হাতের কাজ ভাল, বণিকরা তাদের এগুলো খোদাই করতে দেয় আর খোদাই করার দামও। আমাদের গজদন্তের কাজের খুব চাহিদা।" মরীচি বলল।

"আমাদের পক্ষে মথুরার পাথরই যথেষ্ট।" বাবা বলেন।

"তুমি আমাকে যে টুকরোটা দিলে সেটা দিয়ে আমি কি করেছি দেখবে?"

পাথর কুঁদে তৈরি একটি মেয়ের মূর্তি। মেয়েটি ভিজে চুল নিংড়োচ্ছে আর একটি রাজহাঁস গলা উঁচু করে সেই জলের ফোঁটা খাবে বলে হাঁ করে আছে। অত্যন্ত নিখুঁত কাজ তাতে সন্দেহ নেই।

বাবা খুশি হয়ে বললেন, "এখন তাহলে কি ঠিক করলে? মথুরাতেই থাকবে তো?"

"তোমার কি সেইরকম ইচ্ছে?" ছেলে পাল্টা প্রশ্ন করল।

"আমি ওর জন্যে বৌ ঠিক করে রেখেছি।" কেতকী বলে ওঠে। 'তোমার সঙ্গে কাজ করেন এক কারিগর, তারই মেয়ে।"

"আমাদের স্বজাতির মেয়ে বিয়ে করে তুমি যদি এখানেই থেকে যাও আর আমাদের জাতব্যবসা চালাও, তার চেয়ে বেশি খুশি আমি আর কিসে হব।" বাবা খুশি হয়ে বললেন, "তাছাড়া তুমি কাজও শিখেছ ভাল।"

"ঠিক আছে। অনেকদিন তো ঘুরে বেড়ালাম। এখন কিছুদিন দেশেই থাকি। আমি কথা দিচ্ছি এখন অনেকদিন আমি আর কোথাও যাব না। আবার যদি বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে হয়, তাহলেও ঠিকই ঘরে ফিরবো।"

সমুদ্রগুপ্ত ও সহিসের ছেলে

347 খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্র সহরে মহা হুলস্থুল। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ে বেরোচ্ছেন।

মৌর্যদের পর বেশ কয়েক বছর শুধু যুদ্ধে যুদ্ধে কেটেছে। শেষে 320 খৃষ্টাব্দে আর এক চন্দ্রগুপ্ত এসে গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁর ছেলে সমুদ্রগুপ্তকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে যান। 347 সালের মধ্যেই সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের সমস্ত রাজাদের পরাস্ত করে হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত নিজের রাজ্য বিস্তার করলেন। এবারে তিনি নর্মদার দক্ষিণের বিন্ধ্য অঞ্চলের পাহাড় ও জঙ্গল সমাকীর্ণ প্রদেশে সসৈন্য যাত্রা করবেন ঠিক করেছেন। বড় বিপদসঙ্কুল এই যাত্রা, কারণ সেখানে যাতায়াত বা খবর দেওয়া-নেওয়া প্রায় অসম্ভব।

ঘোড়াশালে সমুদ্রগুপ্তের প্রিয় ঘোড়া রাক্ষস অধৈর্য্য হয়ে পা ঠুকছে। বড় তেজী ঘোড়া। সম্রাটের হাতের ছোঁয়া পেলেই রাক্ষস একেবারে ঠাণ্ডা। রাজা ছাড়া শুধু দু'জনের বাধ্য সে। তার সহিস বেণু আর তার ন'বছরের ছেলে। বেণু তাকে ছোটবেলা থেকে দেখাশোনা করছে আর বেণুর ছেলে তো বলতে গেলে ঘোড়াশালেই মানুষ। কিন্তু বেণুর বড় জ্বর। অন্য সহিসরা বহু চেষ্টা করেও কিছুতে রাক্ষসকে বাগে আনতে পারছে না। তাদের কাছে আসতে দেখলেই সে লাথি ছুঁড়ছে।

তখন তারা বললে, "আচ্ছা, বেণুর ছেলে অশ্বদত্ত কোথায় গেল ?"

"নিশ্চয়ই ওর মা ওকে বন্ধ করে রেখেছে। ওর মার ভয়, পাছে ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে চলে যায়।" সুবর্ণ মনে মনে ভাবল। সুবর্ণ অশ্বরক্ষকদের প্রধান। বেণুর কুটিরে গেল সে। কুটিরে বেণুর স্ত্রী আর মার সঙ্গে দেখা।

"অশ্বদত্ত কোথায় ?"

একটু পরে উত্তর এল, "ও এখানে নেই।"



“অশ্বদত্তকে ডাক, রাক্ষসকে বিদায় জানাবে।”

বুড়ি আর না পেরে বলে ফেলল, “তোমরা কি চাও ছেলেটা বিন্ধ্য-পাহাড়ের জঙ্গলে বাঘের মুখে যাক ?”

“বেণুর ছেলে আর আমার ছেলে কি আলাদা ?” এই বলে সুবর্ণ কোনমতে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

সে চলে যাবার পর দুই রমণী পরস্পরের দিকে তাকাল। “কাল সম্রাট চলে গেলে আমরা অশ্বদত্তকে ছেড়ে দিতে পারি।”

সেদিন সন্ধেবেলা সমুদ্রগুপ্তের কাছে খবর গেল—বাহিনীর সঙ্গে রাক্ষসকে নেওয়া যাবে না।

সমুদ্রগুপ্ত ঘোড়াশালে এলেন। তাঁকে দেখেই রাক্ষস ছুটে এল, কিন্তু অশ্বরক্ষকদের দেখে সে পা ছুঁড়তে লাগল। “এরকম করে তো হবে না,” সম্রাট বললেন। “একে চালাতে পারবে এমন কাউকে চাই।”

“আমি পারবো, আমি পারবো” সরু গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। নোংরা, খালি-গা একটা ছোট্ট ছেলে কোথা থেকে হাজির। তাকে দেখেই ঘোড়াটা শান্ত হয়ে তার কাছে দৌড়ে গেল। ছেলেটি তাকে আদর করতে লাগল।

“তুমি কে ?” সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন।

“ও বেণুর ছেলে মহারাজ।” উত্তর দিল সুবর্ণ।

“আমাকে ঠাকুমা আটকে রেখেছিল। কিন্তু আমাকে মহারাজের ঘোড়ার জন্যে দরকার। আমাকে তাই যেতেই হবে। আমি সেজন্য বেড়া ফুটো করে পালিয়েছি।”

“নিশ্চয়ই, তোমাকে আমাদের খুব দরকার,” সম্রাট হাসলেন। “কিন্তু



তোমার মা আর ঠাকুমাকে তো আগে জিজ্ঞেস করতে হয়। ওদের ডাকা হোক।”

সুবর্ণ তাড়াতাড়ি গিয়ে ওদের ডেকে আনল। “এই ছেলেটিকে তোমরা রাজার সঙ্গে যেতে দিচ্ছ না কেন?” সমুদ্রগুপ্ত জানতে চাইলেন।

ঠাকুমা সাহসে ভর করে উত্তর দিল, “মহারাজ, অশ্বদত্তের বয়স মাত্র নয়। তার ইচ্ছে সে আপনার সঙ্গে যায়। কিন্তু মহারাজ যেমন রাজমাতা মহারাণী কুমারদেবীকে মান্য করে চলেন তেমনি এই বালকেরও কি তার পিতামহীর কথা শুনে চলা উচিত নয়?”

রাজার মা ছিলেন পরাক্রান্ত লিচ্ছবী বংশের কন্যা। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ফলে মগধের সঙ্গে গুপ্ত সম্রাটদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। মহারাজা মাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বললেন, “তুমি অনুমতি দাও, অশ্বদত্তকে আমি নিয়ে যাই। সুবর্ণ ওর দেখাশোনা করবে।”

“আপনি শপথ করুন যে ওকে অক্ষত দেহে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।”

“আমি ওকে নিজের ছেলের মত চোখে চোখে রাখব।” সুবর্ণ বলল।

সকালে যাত্রা। অশ্বদত্তকে তাড়াহুড়ো করে তৈরি করা হল। উত্তেজনায় সে বাড়ির লোকের কাছে বিদায় নিতেই ভুলে গেল।

যাত্রা শুরু হল

সমুদ্রগুপ্ত সসৈন্যে মধ্য ও দক্ষিণ ভারত বিজয়ে অগ্রসর হলেন, সঙ্গে অশ্বদত্ত। সুবর্ণ তার প্রতিজ্ঞা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করত। অশ্বদত্তকে সে নজরে নজরে রাখত। সম্রাটের রান্নাঘর থেকে খাবার আসত তার জন্য। নর্মদার দক্ষিণে জঙ্গল ক্রমশঃ দুর্ভেদ্য, জমি কঠিন ও পাথুরে। সৈন্যরা তাই বাজরা, বনের ফল আর শিকার করা মাংস খেত—খরগোস, বটের, তিতির, ময়ূর যখন যা জোটে।

রাজা ভোরবেলা পূজোয় বসতেন। তখন তিনি অস্ত্র খুলে রাখতেন। অশ্বদত্তও এই সময় বেরোত তেঁতুল, কাঁচা আম ইত্যাদির সন্ধানে।

একদিন ভোরে রাজা পূব দিকে মুখ করে পূজোয় বসেছেন এমন সময় দেখেন একটা ডোরাকাটা জন্তু লাফ দেবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কে যেন রাজার হাতে একটা তীর ধনুক ধরিয়ে দিল। সে আর কেউ নয়, অশ্বদত্ত। আমগাছ থেকে সেও বাঘটাকে দেখতে পেয়েছিল।

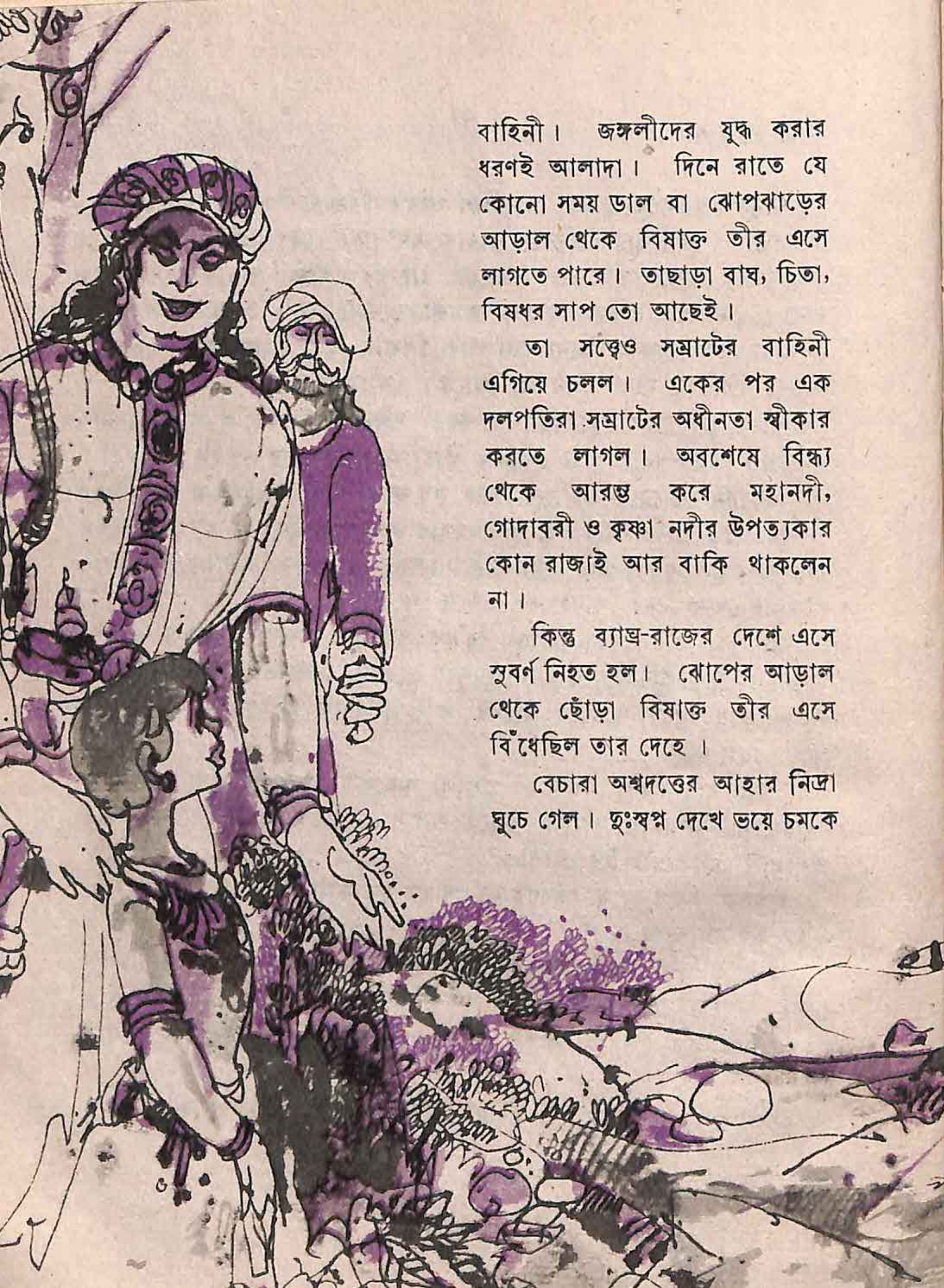
সম্রাটের তীর গিয়ে সোজা বিঁধল বাঘটার গলায়। আহত বাঘটা গড়িয়ে পড়ল। প্রহরীরা তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে, কিন্তু তার আগেই অশ্বদত্ত একটা ছুরি নিয়ে সজোরে বাঘের গায়ে বিঁধিয়ে দিয়েছে। বাঘটা মরে পড়ে রইল।

"বাঃ সাবাস।" মহারাজা প্রশংসা করলেন। সকলেই ভীড় করে এসে মহারাজের নিশানার তারিফ করতে লাগল। রাজা কিন্তু বললেন, "সব প্রশংসাই এই ছেলেটির প্রাপ্য।"

অশ্বদত্ত ফিরে দেখে সুবর্ণের মুখ মেঘের মত কালো। "কতবার বলেছি একা জঙ্গলে যাবে না!"

"বাঃ, ভাগ্যিস্ আমি ছিলাম, তাই না রাজাকে বাঁচতে পারলাম।" বলেই অশ্বদত্ত সুবর্ণকে জড়িয়ে ধরে কথা দিল যে এবার থেকে সে আর অবাধ্য হবে না। অবশ্য এরকম কথা এই নিয়ে সে বোধ হয় একশো বার দিল।

মধ্যভারতের ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল রাজার সৈন্য-



বাহিনী। জঙ্গলীদের যুদ্ধ করার ধরণই আলাদা। দিনে রাতে যে কোনো সময় ডাল বা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বিষাক্ত তীর এসে লাগতে পারে। তাছাড়া বাঘ, চিতা, বিষধর সাপ তো আছেই।

তা সত্ত্বেও সম্রাটের বাহিনী এগিয়ে চলল। একের পর এক দলপতিরা সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করতে লাগল। অবশেষে বিন্ধ্য থেকে আরম্ভ করে মহানদী, গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর উপত্যকার কোন রাজাই আর বাকি থাকলেন না।

কিন্তু ব্যাঘ্র-রাজের দেশে এসে সুবর্ণ নিহত হল। ঝোপের আড়াল থেকে ছোঁড়া বিষাক্ত তীর এসে বিঁধেছিল তার দেহে।

বেচারা অশ্বদত্তের আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে চমকে

উঠত সে। ক্রমশঃ সে শুকিয়ে যেতে লাগল। সম্রাট সেটা লক্ষ্য করে তাকে একদিন বললেন, "দুঃখ করে কি হবে অশ্বদত্ত। তুমি যদি অসুখে পড়, তাহলে রাক্ষসকে কে দেখবে? আজ থেকে তুমি আমার পাশের ঘরে ঘুমোবে।"

সেদিন রাত্রে অশ্বদত্ত নির্ভয়ে ঘুমোল। তারপরেও পর পর কয়েকদিন সে আর দুঃস্বপ্ন দেখল না। লতা আর বাঁশে তৈরি জঙ্গলের রাজপ্রাসাদ। তারই বাইরের বারান্দায় ঘুমোত সে। একদিন রাত্রে সে ভারি সুন্দর বাজনা শুনতে পেল। রাজার ঘর থেকে আসছে মনে হয়। ডালের ফাঁকে কান দিয়ে সে শুনছে এমন সময় বর্ষার এক খোঁচা। কে যেন হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, "আরে ইঁদুরটা কোত্থেকে এল রে?"

অশ্বদত্ত ঘাবড়ে গেলেও সাহস সঞ্চয় করে উত্তর দিল, "আমি অশ্বদত্ত। রাজার অশ্ব-রক্ষক। কিছু করছিলাম না। শুধু বাজনা শুনছি।"

"কি আস্পর্দ্ধা! রাজার বাজনা শুনছো? জানো এর শাস্তি মৃত্যু!"

আরেকটা গলা বলল, "আমাদের রাজা তো সঙ্গীতেরও রাজা। ছেলেটা যে মুগ্ধ হয়ে শুনছে তাতে আর আশ্চর্য কি!"



অশ্বদত্ত চিনতে পারল। পরের লোকটি পণ্ডিত হরিষেণ, সম্রাটের সভাসদ্, তিনি আবার বিদ্বান ও যোদ্ধাও বটে। পণ্ডিত হরিষেণকে সম্রাট খুঁজছিলেন, তাই তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন। সমস্ত ঘটনাটা সম্রাটকে বলে তিনি অশ্বদত্তকেও ডেকে নিয়ে গেলেন।

রাজা ঢিলে সুতী জামা পরে সিংহাসনে বসেছিলেন। কোলে বীণা। "অশ্বদত্তের বিছানাটা যেন আমার ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে রাখা হয়। আমার বীণা শুনতে শুনতে ও রোজ ঘুমোবে।" রাজা হেসে বললেন।

রাজার প্রিয় বন্ধুদের, দেখত অশ্বদত্ত, সকলেই পণ্ডিত ও শিল্পী। সম্রাট নিজেও শুধু যে যোদ্ধা ছিলেন তাই নয়, পণ্ডিত, কবি ও সঙ্গীতজ্ঞও বটে

অনেক নগর পার হয়ে এগোতে লাগল তারা। এক একটি নগর, এক একটি রাজ্য। তাদের সভ্যতার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য। পূর্ব





উপকূল ধরে তারা দক্ষিণে এগোতে লাগল। অশ্বদত্ত জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখল।

রাক্ষস ছাড়াও তাদের সঙ্গে আর একটি সুন্দয় ঘোড়া ছিল, তেজীয়ান্ এই অশ্ব ছিল চালকবিহীন, অশ্বমেধের ঘোড়া। যে দেশের মধ্যে দিয়ে এই ঘোড়া যায় তারা সকলেই সমুদ্রগুপ্তকে রাজচক্রবর্তী বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ এই সব দেশেব উপর দিয়ে তাঁর ক্ষমতার চাকা চালানো হয়েছে। পাটলিপুত্রে ফেরার পর এই ঘোড়া যজ্ঞবেদীতে বলি দেওয়া হবে। ঘোড়াটার সঙ্গে অশ্বদত্তের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল, ও প্রায়ই এটা সেটা এনে ঘোড়াটাকে খাওয়াত।

কৃষ্ণা আর গোদাবরীর মধ্যবর্তী ভঙ্গি রাজ্য পার হয়ে গেল তারা। কাঞ্চীতে এক বিশাল সভা বসল। দক্ষিণের সব রাজারা সমুদ্রগুপ্তের জন্য উপহার আনলেন। কাঞ্চী ছিল প্রাচীন শহর, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র, আবার রাজধানীও। লঙ্কার রাজা মেঘবর্ণ দূতের হাতে মণিমুক্তোর পেটিকা পাঠিয়েছিলেন।

ফেরার পথে

সৈন্যবাহিনী এবার ফিরে চলল। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে যে ভূখণ্ডের নাম এখন মহারাষ্ট্র, তারই মধ্যে দিয়ে চলল তারা। তিন বছর হল তারা ঘর ছাড়া। এই তিন বছর সম্রাট সমানে যুদ্ধ করেছেন, শিকার করেছেন, নয়ত যুদ্ধের পরামর্শে সময় কাটিয়েছেন। রাত্রে হত ধর্ম আলোচনা, কবিতা পাঠ, গান বাজনা। মাঝে মাঝে সভা হত, যখন অন্য রাজারা তাঁর জন্যে নানা উপহার আনতেন।

এই ক'বছরে অশ্বদত্তের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। অনেক বড় হয়েছে সে, গায়ে জোর হয়েছে, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে আর আগের মত দুষ্টু নেই।

পাটলিপুত্রে এখন ব্রাহ্মণদের ভীড়। সকলে এসেছেন অশ্বমেধ যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করতে। এই যজ্ঞ সেই মহাভারতের যুগে একবার হয়েছিল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির করেছিলেন।

ইতিমধ্যে অশ্বদত্তের সঙ্গে অশ্বমেধের সুন্দর ঘোড়াটির বড় ভাব হয়ে গেছে। যজ্ঞের আগের দিন রাত্রিবেলা সে চুপিচুপি গিয়ে তাকে শেষবারের মত একটু আদর করে এল। পরের দিন ফুলে মালায় সাজিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে যাওয়া হল বেদীর কাছে। সেইখানে বলি দেওয়া হল তাকে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণের জন্য এই উপলক্ষ্যে সোনার মোহর বার করা হয়েছিল। অশ্বদত্তও একটা পেল, আরো কিছু মোহর জমেছিল তার। সে বাড়িতে নিয়ে এল সেগুলো।

রাত্রে বাড়ির সকলকে সে মোহরগুলো দেখিয়ে লেখাগুলো বুঝিয়ে দিল, "এই রকম সুন্দর মোহর আগে কোনো রাজারা বার করেননি। এগুলোকে বলে দিনার। এই নতুন দিনারটা দেখ। অশ্বমেধের ঘোড়াটার ছবি আছে এতে।"

মোহরটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ওর মা বললেন, "এদিকে দেখছি এক মহিলার মূর্তি।"

"উনি হলেন সম্রাটের মহিষী। মহারাণী দত্তাদেবী। লেখা আছে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ'। মহারাজ এই মহৎ ঘটনার সঙ্গে মহারাণীর নাম যুক্ত করে রাখছেন।"

"এবারে এই মোহরটা দেখ মা" অশ্বদত্ত বলেই চলল, "মহারাজ বীণা নিয়ে বসে। ধুতি পরে, কাণে হীরের কুণ্ডল, মাথায় মুক্তোর গহনা, হাতে দামী তাবিজ। অন্য পিঠে লক্ষ্মীর মূর্তি।"

একদিন লঙ্কার রাজা মেঘবর্ণের কাছ থেকে বৌদ্ধ দূত এল। সঙ্গে নানাবিধ দামী দামী উপহার। মেঘবর্ণ মহারাজকে একটি অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। সিংহল থেকে নাকি বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীরা বুদ্ধগয়ায় এসেছিল। সেখানে সম্রাট অশোকের তৈরী মঠে তারা থাকার জায়গা পায়নি। সুতরাং মেঘবর্ণ বৌদ্ধ তীর্থযাত্রীদের জন্য একটি মঠ তৈরি করতে চান। সম্রাটের অনুমতিক্রমে জায়গা ঠিক হল, তৈরী হল অপূর্ব এক মঠ। তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট উঁচু প্রাচীরে ঘেরা তিনতলা মঠ। ছটি বিশাল ঘরের উপর তিনটি বুরুজ। ভিতরে সোনা আর রূপোর তৈরী বুদ্ধমূর্তি—বহুমূল্য পাথরে খচিত। লঙ্কা এই সব পাথরের জন্য বিখ্যাত।

সম্রাট, তাঁর রাণী ও যুবরাজ সকলেই বিষ্ণুর উপাসক, তাই বৌদ্ধদের প্রতি এত করুণা দেখেই অশ্বদত্তের মা বেশ আশ্চর্যই হলেন।

অশ্বদত্ত তখন বলল বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধুর রাজসভায় কত খাতির।

"কিন্তু সম্রাটের প্রিয় বন্ধু তো পণ্ডিত হরিষেণ, তিনি ব্রাহ্মণ।" অশ্বদত্তের বাবা বললেন।

"হরিষেণ পাটলিপুত্রে নামকরা লোক। কবি হিসেবে আর সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবে তাঁকে সবাই চেনে। কিন্তু পণ্ডিত বসুবন্ধুর খ্যাতি বহু দেশে ছড়িয়েছে। লঙ্কা, পুরুষপুর এমনকি চীন থেকে পর্যন্ত তিনি নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাছাড়া আমাদের রাজারা সব সময়েই অন্য ধর্মগুরুদের শ্রদ্ধা করেছেন, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সব রকম সুযোগ সুবিধে দিয়েছেন।"

অশ্বদত্ত এখন রাজার খুবই প্রিয়পাত্র। রাজার সঙ্গে সে অনেকবার ভ্রমণে বেরিয়েছে। শেষ বার গিয়েছিল প্রয়াগে (এলাহাবাদ)। তারপরেই অশ্বদত্তের বাবা মারা যান।

সম্রাট ততদিনে বুড়ো হয়েছেন। বন্ধু পণ্ডিত হরিষেণ সম্রাটের কীর্তির কথা কবিতায় লিখেছেন। সুন্দর সংস্কৃতে লেখা সেই কাব্য কৌশাম্বীতে এক পাথরের স্তম্ভের গায়ে খোদিত আছে। এই স্তম্ভটি প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো।

অশ্বদত্ত তার মা বাবাকে কবিতায় কি লেখা আছে বুঝিয়ে দিল ; এতে আছে সমুদ্রগুপ্তের গুণের কথা—যোদ্ধা, সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি হিসেবে তাঁর কীর্তির বর্ণনা। তাছাড়া আছে পূবে, উত্তরে ও দক্ষিণে তাঁর জয়যাত্রার কথা।



অশ্বদত্তের মা বললেন, "সেই যে প্রথমবার তুই সম্রাটের সঙ্গে বিদেশ গেলি—আমরা কত কাঁদলাম। তারপর থেকে তুই কত কি শিখেছিস, কত দেশ ঘুরেছিস। এ সবই কিন্তু রাক্ষসের জন্য, কারণ তুই না গেলে ও কিছুতেই যেত না।"

পরাক্রান্ত সম্রাট হর্ষ

হর্ষ কনৌজের রাজা হলেন

বিন্ধ্য পর্বতের গহন অরণ্যে একটি সাজানো চিতার সামনে তিনটি দীর্ঘদেহী রমণী দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের চেহারায় দুঃখের ছাপ।

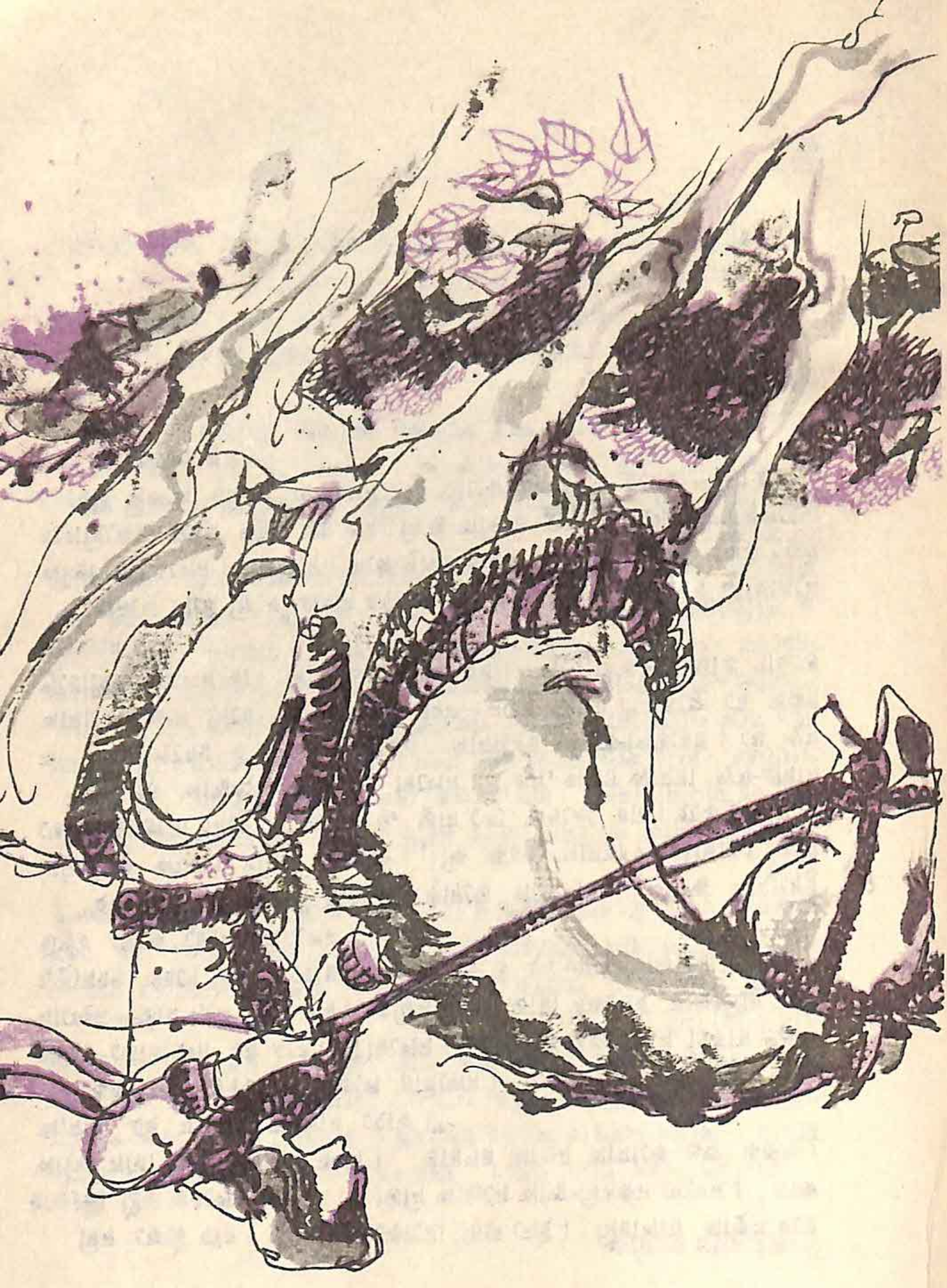
মহিলাদের দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল এঁরা পাহাড়ী নন। পাহাড়ীরা হয় বেঁটে আর কালো। এঁদের মধ্যে একজনের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি নিশ্চয় রাজার ঘরের কেউ হবেন। ইনি রাজকন্যা রাজ্যশ্রী। এঁর বাবা ছোট্ট থানেশ্বর রাজ্যের রাজা হলে কি হয়, হুণদের তাড়িয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। গুপ্ত রাজা স্কন্দগুপ্তের সময় থেকে হুণরা বার বার আক্রমণ করে দেশ বিধ্বস্ত করেছে। রাজ্যশ্রীর বাবার হাতে তারা অবশেষে বিতাড়িত হয়।

রাজার দুই ছেলে, রাজ্যবর্ধন আর হর্ষ। মেয়ে রাজ্যশ্রী দেখতে পরমা সুন্দরী। রাজা তাঁর বিয়ে দেন কনৌজের রাজার সঙ্গে। আর্যাবর্তের মধ্যে কনৌজ শ্রেষ্ঠ নগরী।

হঠাৎ উত্তর থেকে হুণরা আক্রমণ করল। রাজপুত্র রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে একদল সৈন্য দিয়ে রাজা তাঁকে পাঠালেন। হর্ষও সঙ্গে গেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র পনেরো। অল্প বয়স বলে রাজ্যবর্ধন তাঁকে আর যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন না। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে হর্ষ থেকে গেলেন। অরণ্যে হিংস্র জন্তুর অভাব ছিল না, হর্ষও মনের সুখে শিকার করে সময় কাটাতে লাগলেন।

এমন সময় খবর এল রাজা মৃত্যুশয্যায়। হর্ষ তাড়াতাড়ি দেশে ফিরলেন। উটের পিঠে দূত ছুটল রাজ্যবর্ধনের কাছে। ইতিমধ্যে হুণদের তীরে রাজ্যবর্ধন আহত হয়েছেন। তারপর বিপদের উপর বিপদ। থানেশ্বরের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে পশ্চিম মালবের রাজা কনৌজ আক্রমণ করে রাজাকে হত্যা করলেন। রাজ্যশ্রী বন্দী হলেন।

রাজ্যবর্ধন তাঁর অশ্বারোহী সেনা নিয়ে দ্রুত গিয়ে মালবের রাজাকে



পরাজিত করলেন। রাজ্যশ্রী ইতিমধ্যে এক গুপ্তবংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্যে কারাগার থেকে পালিয়ে গেছেন। তাঁর ভাই সেকথা জানতেও পারেননি। এক বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজ্যশ্রীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন বিন্ধ্যাচলের অরণ্যে এক বৌদ্ধ মঠে।

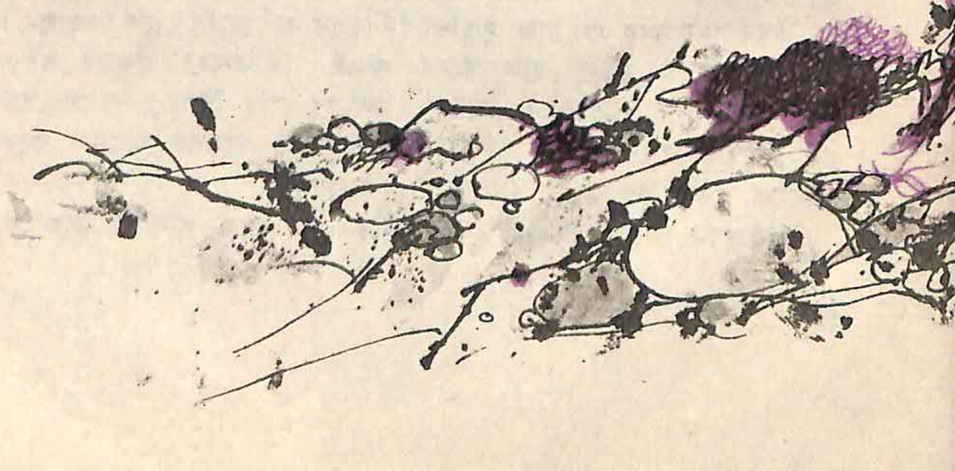
কিন্তু বর্ধন রাজকুমারদের বিপদের তখনো শেষ হয়নি। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক বন্ধুত্বের ভান করে রাজ্যবর্ধনকে ডেকে পাঠালেন। শশাঙ্ক ছিলেন মালবরাজের মিত্র। কোনো সন্দেহ না করে রাজ্যবর্ধন গেলেন, সঙ্গে একটিও সৈন্য না নিয়ে। শশাঙ্ক তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তাঁর হাতে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারালেন।

এখন সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল হর্ষের উপর। ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ও বোনকে উদ্ধারের জন্য তিনি তখনই যাত্রা করলেন।

রাজ্যশ্রীর তখন দুঃখে হতাশায় শরীর মন ভেঙ্গে পড়েছে। "আমার পিতা, বড় ভাই, স্বামী সকলেই মৃত—আমার তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি—" সঙ্গিনীদের কাছে এই কথা বলে তিনি চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হলেন।

"কেন, তোমার ছোট ভাই হর্ষ তো আছে। জঙ্গলী দলপতিরা কথা দিয়েছে যে তাঁকে এইখানে নিয়ে আসবে।"

"হর্ষ বেচারীর বয়স কম, এই বয়সেই ওর ঘাড়ে কত দায়িত্ব এসে পড়েছে।"



দিন কেটে যায়। সাহায্যের কোনো চিহ্ন নেই। নিরাশায় আকুল হয়ে রাজ্যশ্রী ঠিক করলেন পরের দিন তিনি আগুনে আত্ম-বিসর্জন দেবেন। "আজ আমি সারা রাত প্রার্থনা করব। তারপর আগুন আমাকে শুদ্ধ করুক। আমার এই যন্ত্রণার অবসান হোক।"

কিন্তু ভাগ্যদেবতা মুখ তুলে চাইলেন। সমস্ত দিন সমস্ত রাত ঘোড়া ছুটিয়ে ভোরবেলা হর্ষ এসে পৌঁছলেন। রাজ্যশ্রী ঠিক তখনি চিতায় উঠতে যাচ্ছেন—তাঁর সঙ্গে তাঁর সমস্ত সঙ্গিনীরা। তারা সকলেই রাজ্যশ্রীর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবে ঠিক করেছে। সেই মুহূর্তে হর্ষ এসে রাজ্যশ্রীকে চিতার উপর থেকে টেনে আনলেন।

"হর্ষ, তুমি এসেছো!" রাজ্যশ্রী কাঁদতে লাগলেন। "কিন্তু আমাদের চারিদিকে অমঙ্গল ঘনিয়ে এসেছে। কি করব আমরা? তাছাড়া তুমি তো পড়াশুনো নিয়ে থাকতে চাও, তুমি তো কখনো রাজা হতে চাওনি!"

হর্ষ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে উত্তর দিলেন। "এস, আগে আমরা সূর্য-প্রণাম করি—যে সূর্যের উপাসনা করেছেন আমাদের পিতৃ-পিতামহ; যে সূর্য আমাদের জন্য নিয়ে আসে নতুন দিন, নতুন জীবন।" সঙ্গে যে তরুণ পুরোহিত ছিলেন তাঁর দিকে তাকালেন হর্ষ। পুরোহিত সূর্য স্তুতি গাইতে লাগলেন।

বোনকে নিয়ে ফিরে এলেন হর্ষ, তারপর কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। মন্ত্রীদের সঙ্গে যুক্তি করেই এটা করা হল। কেউ কেউ বলেছিলেন হর্ষের বয়স বড় কম, কিন্তু অভিজ্ঞ সেনাপতি সিংহানন্দ বললেন হর্ষকেই সকলে চায়। এইভাবে 505 খৃষ্টাব্দে এক নতুন যুগের সূচনা হল—যে যুগ হর্ষের যুগ।

পঁয়ত্রিশ বছর পরের কথা। এখন হর্ষ আর রাজ্যশ্রীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দেশের অবস্থাও আগের মত নেই। রাজধানী কনৌজ এখন পশ্চিমে গঙ্গা ও অন্য তিন দিকে পরিখা আর দুর্গ দিয়ে সুরক্ষিত। কনৌজ নগরে কত মন্দির, কত বৌদ্ধ বিহার, কত কাঠ ও ইঁটের কারুকার্যখচিত ঘরবাড়ি তার ইয়ত্তা নেই।

হর্ষ এখন সমস্ত আর্যাবর্তের অধিপতি। রাজ্যশ্রী রাজোচিত গাম্ভীর্যে ভাইয়ের পাশে বসে পণ্ডিতদের আলোচনা শোনেন। রাজা সব রকম ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় উৎসবে অনুরাগী। সুতরাং রাজ্যে নানা উৎসব লেগেই থাকে।

একটি বৌদ্ধ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে হর্ষ এক নাটক লিখেছিলেন। নাটকের নাম নাগানন্দ। এক পণ্ডিত সেই নাটকের অভিনয় করাচ্ছিলেন। পণ্ডিতের ছেলে পুণ্ডরীক অভিনয় দেখে বসুভূতি আর আয়াম নামে তার দুই বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করছিল। পুণ্ডরীক বলছিল, "আমাদের সম্রাট অশোক, সমুদ্রগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের চেয়ে কোন অংশে কম নন। নাগানন্দ নাটকের নায়ক রাজা জীমূতবাহনের বর্ণনা দিয়ে হর্ষ বলছেন, 'ইনি দয়াবান ও শান্তিপ্রিয়, ইনি অপরের সুখে সুখী, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য ইনি আত্মদান করতেও প্রস্তুত। আমার বাবা বলেন কথাগুলো কিন্তু রাজা হর্ষ সম্বন্ধেও বলা চলে।"

"কিন্তু পুণ্ড"—বন্ধু আয়াম বলে, "তুমি যে উল্টোপাল্টা কথা বলছ। হর্ষ কি করে একই সঙ্গে অশোক আর সমুদ্রগুপ্তের মত হতে পারেন। অশোক যুদ্ধ বর্জন করেন আর সমুদ্রগুপ্ত যুদ্ধ করে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ জয় করেন।"

"আর সম্রাটের সৈন্যদলের কথা মনে কর" বসুভূতি যোগ দেয়। "আগে সেনাদলে ছিল 5000 হাতি, 20,000 অশ্বারোহী আর 50,000 পদাতিক ; আর এখন আছে 60,000 হাতি আর 100,000 পদাতিক !"

"শান্তি স্থাপনের জন্য হর্ষকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, ভুলে যেওনা,"

পুণ্ডরীক বলে। "হূনরা গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পর আর্যাবর্তে আর কোন শক্তিশালী রাজা ছিল কি?"

"ছ'বছর ধরে সৈন্যরা ক্রমাগত যুদ্ধ করে গেছে। বহু কষ্টে সমস্ত রাজ্য এক সম্রাটের অধীনে এল। এখন রাজা হর্ষ নেপাল ও হিমালয় থেকে আরম্ভ করে নর্মদা পর্যন্ত সমস্ত গাঙ্গেয় সমভূমির অধীশ্বর। দূর দূরান্তের রাজারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছেন। পূবে কামরূপের (আসাম)



রাজা থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে বল্লভী পর্যন্ত। কামরূপের রাজা তাঁর বন্ধু আর বল্লভীরাজের সঙ্গে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন।"

প্রভাকর পণ্ডিত ছেলেদের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, "কিন্তু রাজা হর্ষ প্রজাদের কিসে মঙ্গল হয় কেবল সেই চেষ্টাই করেন। তিনি পথিকদের জন্য পান্থশালা করিয়েছেন; মানুষ ও পশুদের জন্য চিকিৎসালয়। চোর ধরার জন্য আছে চৌরধারিকরা, ফসল কাটার সময়



তিনি পাহারার ব্যবস্থা করেন। পথে ঘাটে, গ্রামে নগরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে কিনা রাজা নিজেই ঘুরে ঘুরে দেখেন।"

"আচ্ছা, রাজা সারাদিন কি করেন?" বসুভূতি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

"দিনের খানিকটা সময় যায় রাজকার্যে। মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে রাজা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে পাঠানো বার্তা গ্রহণ করেন, উত্তর লিখে পাঠানো হয়। বার্তার আদানপ্রদানের জন্য একটা আলাদা বিভাগই আছে। উটের পিঠে করে এই সব খবর দ্রুত চলে যায়।

"যখন রাজা ভ্রমণে বেরোন তখন পথের মধ্যে লতাপাতার শিবিরেও কিন্তু রাজকার্য চালাতে ভোলেন না। তা না হলে তাঁর সব কাজ কি করে শেষ হবে?"

"দিনের কিছুটা সময় কাটে দানধ্যান করে। ধার্মিকদের ও দরিদ্রদের তিনি অকাতরে দান করেন। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলিও তাঁর দান থেকে বঞ্চিত হয় না। এই সব দানের জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা ছকে রাখতে হয় এবং সেইমত কাজ হচ্ছে কিনা তারও তদারকি করতে হয়। রাজার পাকশালায় প্রতিদিন অসংখ্য ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আহার করেন।"

"রাজার পূর্বপুরুষরা তো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন না। তাহলে রাজা কেন বৌদ্ধধর্মে এত অনুরাগী?" আয়াম জানতে চায়।

"রাজার পূর্বপুরুষরা অনেক দেবদেবীর উপাসক ছিলেন। একজন ছিলেন শিবের উপাসক। রাজার পিতা প্রভাকরবর্ধন আদিত্য অর্থাৎ সূর্যের ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রত্যেকদিন সূর্যের উদ্দেশ্যে লাল পদ্মরাগমণি-খচিত পাত্রে লাল পদ্ম নিবেদন করতেন। সম্রাট হর্ষ শিব, আদিত্য ও বুদ্ধের মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। নালন্দার বিখ্যাত বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ের তিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক। প্রতি পাঁচ বছর রাজা এক মহাসভার আয়োজন করেন, যেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে জ্ঞানীগুণীরা এসে আলোচনা করেন ভাব বিনিময় করেন।"

"আর এই মহাসভায় প্রচুর পরিমাণে দানও করা হয়, তাই না?" বসুভূতি প্রশ্ন করে।

"পাঁচ বছরে রাজকোষে যত অর্থ সম্পদ জমা পড়ে তার সমস্ত দান করে দেওয়া হয় দরিদ্র, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে। রাজা নিজের রত্ন-ভূষণ, এমনকি জামাকাপড় পর্যন্ত বিতরণ করে বোনের কাছ থেকে একটি পোষাক নিয়ে পরেন। রাজার পোষাক ও গহনা থেকে যে অর্থ পাওয়া যায় তা ভিক্ষুরা ধর্মগ্রন্থ নকল করানোতে ব্যয় করেন।"

"রাজার আর কি কাজ?" বসুভূতি জানতে চায়।

"দিনের কিছুটা সময় তিনি সাহিত্য আলোচনা করেন। কবিতা প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে প্রতিযোগীরা নিজেদের লেখা পাঠ করেন। রাজা হর্ষ নিজেও বই লিখেছেন—কয়েকটি নাটক ও একটি ব্যাকরণের বই। রাজার পরম বন্ধু বাণভট্ট তো একজন বিখ্যাত লেখক।" এই বলে প্রভাকর পণ্ডিত নিজের কাজে চলে গেলেন।

"বাবা আমাকে ভূর্জপত্রে লেখা বাণভট্টের একটা গল্প পড়তে দিয়েছিলেন," আয়াম বলল, "কিন্তু যা শক্ত সংস্কৃত, এখন নাকি উনি রাজার জীবনী লিখছেন—হর্ষচরিত।"

"রাজার ভাষা কিন্তু বেশ বোঝা যায়, আর পড়তেও ভালো লাগে," বসুভূতি বলে। নাগানন্দ পড়তে আমার খুব ভাল লেগেছিল। এই নাটকে রাজা জীমূতবাহন নাগদের বাঁচাবার জন্য তাদের বদলে নিজেই গরুড়ের সামনে হাজির হন। তিনিই আসলে বোধিসত্ত্ব। সমস্ত নাগজাতির শত্রু হল গরুড়। তাছাড়া রাজার হাতের লেখাও ভারি সুন্দর।"

"আমার খুব ইচ্ছে করে নালন্দার মহাবিদ্যালয়ে যাই। ওদের পুস্তকাগার তিনটে বাড়ি জুড়ে—তার মধ্যে হাজার হাজার পুঁথি," পুণ্ডরীক তার মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে বলে।

"আমিও চাই একবার নালন্দা গিয়ে ওদের বিরাট জল-ঘড়িটা দেখে আসি। ঐ ঘড়িটা দিয়েই তো সমস্ত উত্তরাপথের সময় ঠিক হয়," বসুভূতি বলে।

"অবশ্য আমরা ঢুকতে পারব কিনা জানি না," পুণ্ডরীক সন্দেহ প্রকাশ

করে। "নালন্দায় যাঁরা পড়তে যান তাঁরা সকলেই বিদ্বান। প্রবেশ পথে যাঁরা পাহারা দিচ্ছেন তাঁরাও এক একজন মহাপণ্ডিত। যাঁরা ভিতরে আসতে চান তাঁদের নানারকম প্রশ্ন করা হয়। শুনেছি প্রতি দশজনে মাত্র দুই বা তিনজন প্রবেশের অধিকার পান।"

"তবে যে শুনেছি সেখানে ৫০০০ ছাত্র আছেন?" বসুভূতি প্রশ্ন করে।

"তাঁরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন। বিদেশ থেকেও এসেছেন কতজন। লঙ্কা থেকে, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ থেকে এসেছেন ছাত্ররা", পুণ্ডরীক বলে।

"ভেতরে যাবার অনুমতি পেলেও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে সেটা ভুলো না, বসুভূতি," আয়াম মনে করিয়ে দেয়। "যাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তাঁদের পুষ্পে মাল্যে ভূষিত করে হাতীতে চড়িয়ে নগর পরিক্রমায় নিয়ে যাওয়া হয়। আর যাঁরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন, তাঁদের বোধহয় মুখে চুনকালি দিয়ে আর লেজের দিকে মুখ করে গাধায় চড়ানো হয়।"

"তাহলে থাক বাবা, আমার আর পুণ্ডুর নালন্দা দরকার নেই" ঘাবড়ে গিয়ে বসুভূতি বলে।



প্রভাকর পণ্ডিত কি কাজে যাচ্ছিলেন। ছেলেরা তাঁকে দেখে আব্‌দার ধরল, "আমাদের নালন্দার কথা বলুন।"

"ইউয়ান চুয়াং আসছেন, বিদেশী পণ্ডিত—আমাকে তাঁর সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করতে হবে। উনি নালন্দায় গিয়েছিলেন একই সঙ্গে তীর্থযাত্রী ও ছাত্র হিসেবে। তাঁর খ্যাতি আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল, তাই মহাস্থবির শীলভদ্র তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন। তু'শো জন ভিক্ষু পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করে তাঁকে ভেতরে আনলেন। ঘণ্টা বাজানো হল। ইউয়ান চুয়াংকে নালন্দায় স্বাগত জানানো হল। তাঁর যত দিন ইচ্ছে থাকার এবং ইচ্ছেমত কাজ করার স্বাধীনতা তাঁকে দেওয়া হল।"

পুণ্ডরীক জিজ্ঞেস করল, "তাহলে উনি নালন্দা থেকে চলে এলেন কেন?" "উত্তরের সব রাজারাই চান তাঁদের রাজসভায় ইউয়ান চুয়াঙের মত একজন পণ্ডিত অতিথি আসুন। তিনি নালন্দায় আসার আগে কাশ্মীরের রাজা

তাঁকে অত্যন্ত সমারোহ করে বরণ করেছিলেন, তাঁকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই পথ ছিল ফুলে ঢাকা, তার ওপরে সুগন্ধি বতর্ষি হচ্ছিল। ইউয়ান চুয়াং সেখানে দু'বছর একটা মঠে থেকে ভাল করে সংস্কৃত শেখেন। যে সব বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ তিনি চীনে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক, সেগুলি নকল করার জন্য রাজা তাঁকে কুড়িজন লোক দিয়েছিলেন। নালন্দায় পৌঁছবার আগে তিনি বহু মঠ দর্শন করেছেন। আমাদের সম্রাট এবং কামরূপের রাজা ভাস্কর তাঁর মুখে দর্শন ও ধর্ম আলোচনা শোনার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ইউয়ান চুয়াং সবিনয়ে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন নালন্দায় তাঁর অধ্যয়নে ব্যাঘাত ঘটে এমন কিছু তিনি করতে চান না। তাতে রাজা ভাস্কর রেগে গিয়ে বলেন নালন্দায় তিনি আগুন লাগিয়ে দেবেন। পরে অবশ্য ইউয়ান চুয়াং কামরূপের রাজসভায় গিয়েছিলেন। যখন হর্ষ শুনলেন এই চীনা পণ্ডিত তাঁরই এক সামন্ত রাজার সভায় এসেছেন, তখন তিনি ভাস্করকে লিখলেন অবিলম্বে যেন পণ্ডিতকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভাস্কর তার উত্তরে জানালেন প্রয়োজন হলে নিজের মস্তকটি তিনি সম্রাটকে পাঠাতে রাজি আছেন, কিন্তু অতিথিকে তিনি কিছুতেই পাঠাবেন না। হর্ষ জানালেন, 'তাহলে আপনি অনুগ্রহ করে আপনার মাথাটাই পাঠান।' তখন ইউয়ান চুয়াংকে সঙ্গে করে ভাস্কর নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। চীনা পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে হর্ষ এতই মুগ্ধ হন যে তিনি ধর্মালোচনার জন্য এক সভা আহ্বান করবেন ঠিক করলেন। স্থির হল সব পণ্ডিতের সেখানে যোগদানের অধিকার থাকবে। সম্রাট দেখতে চান এই বাগ্মী মানুষটিকে কেউ তর্কে পরাস্ত করতে পারেন কি না। তিনি অবশ্য ইউয়ান চুয়াংকে আগেই ন্যায় শিরোমণি উপাধি দেন।"

"ধর্ম মহাসভার আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। যাঁরা আসছেন তাঁদের প্রত্যেকের জন্য থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কয়েক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এসেছেন—নালন্দা থেকেই এক হাজার। আঠারোজন সামন্ত রাজা তাঁদের অনুচরবর্গ নিয়ে সম্রাটকে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত। কামরূপের ভাস্কর ও বল্লভীর ধ্রুবসেন সম্রাটের সঙ্গেই আসছেন।"

"শহরের উপকণ্ঠে এক বিশাল চন্দ্রাতপ পড়েছে। প্রবেশ পথের



উপর বিরাট তোরণ তৈরি হবে। বিদেশী পণ্ডিত তাঁর এখানে অভিমত উপস্থিত করবেন এবং তাঁকে পরাস্ত করার জন্য আহ্বান জানাবেন।”

ধর্ম মহাসভা আরম্ভ হল। পুণ্ডরীক ও তার বন্ধুরা সেখানে গিয়েছিল। ন্যায়শিরোমণির মতামত সাদা কাপড়ের উপর লাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা হয়েছিল। পুণ্ডরীক সংস্কৃত জানত, তাই তার উপর ভার পড়েছিল তোরণের উপর এই কাপড়টি টাঙ্গিয়ে দেবার।

উঁচু বেদীর উপর সোনার বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল। বেদীর নীচে বিশেষ ব্যক্তিদের আসন, তার মধ্যে ইউয়ান চুয়াংও ছিলেন।

চার দিন ধরে আলোচনা চলল। মহাযান মতের স্বপক্ষে বললেন বিদেশী পণ্ডিত। তাঁর বক্তব্য শুনে সম্রাট ও তাঁর বোন এই মতের যাথার্থ্য স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

বিরোধী পক্ষের কেউ এই বিদেশী পণ্ডিতের মত তর্কে পটু ছিলেন না, তাই তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন। সম্রাটকেও যথেষ্ট সমালোচনা করলেন তাঁরা। এমন কি পুণ্ডরীক ও তাঁর বন্ধুদের মধ্যেও এই নিয়ে একচোট বচসা হয়ে গেল।

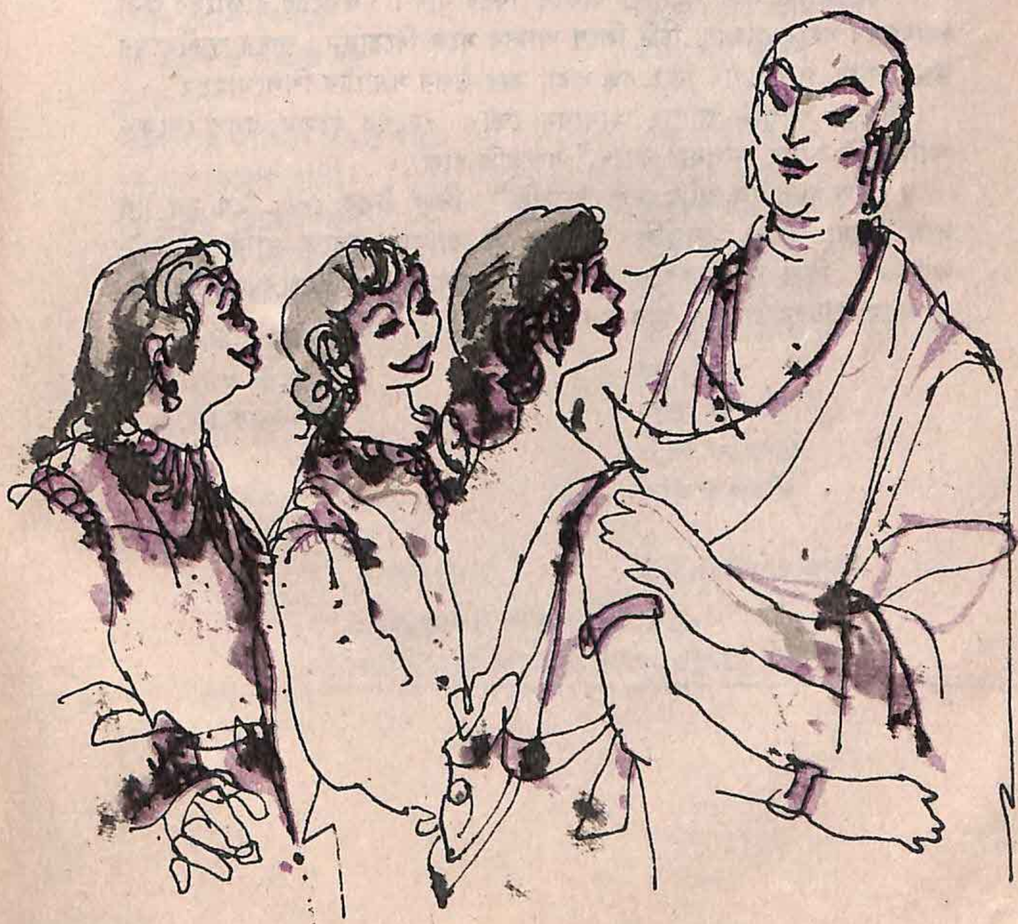
“রাজার ভয়ে কেউ বিদেশী পণ্ডিতের বিরুদ্ধে কিছু বলছে না,” আয়াম বলল।

“আমার বাবা, কবি বাণভট্ট, কামরূপের রাজা এঁরা কেউই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেননি। এঁরা সকলেই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ,” পুণ্ডরীক বলল। “শাস্তির ভয়ে মুখ বন্ধ করে থাকা সততার পরিচয় নয়। ইউয়ান চুয়াং একজন সত্যিকার জ্ঞানী। ইনি যেমন শেখাতে চান, তেমনি শিখতেও চান।”

এক বছর পরে ইউয়ান চুয়াং দেশে ফেরার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনটি ছেলে তাঁর কাছে আশীর্বাদ চাইতে এল।

"প্রভু, আপনি কেন থাকছেন না? বাবা বলছেন সম্রাট আর রাজা ভাস্কর দু'জনেই আপনাকে থাকার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করছেন," পুণ্ডরীক জিজ্ঞেস করলে।

"আমার প্রতি সকলে যা সহৃদয় ব্যবহার করেছেন তার তুলনা নেই।



কিন্তু আমি যে রত্নের সন্ধানে এসেছিলাম তাকে তো নিয়ে যেতে হবে," বিদেশী বললেন।

"আপনি যখন দেশে ফিরবেন রাজা আপনার ঝুলি মণিমাণিক্যে বোঝাই করে দেবেন, প্রভু," আয়াম জানাল।

"তীর্থযাত্রী কি নিজের জন্য কিছু চায়?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "আমার মঠ ও আমার দেশের লোকদের জন্য আমি সর্বশ্রেষ্ঠ ধন নিয়ে যাচ্ছি—650টি সংস্কৃত পুঁথি। তাছাড়া ভগবান বুদ্ধের মূর্তি ও স্মৃতি-চিহ্ন।"

"তাহলে কি আপনি এখন কোন দলের অপেক্ষা করছেন?" বসুভূতি জিজ্ঞেস করল।

"না, আমি একা এসেছি, একাই ফিরে যাব। উত্তরের রাজাদের জন্য তোমাদের মহান্ রাজারা চিঠি লিখে আমার সঙ্গে দিয়েছেন। সুন্দর সুতীবস্ত্রের উপর লেখা, লাল মোম দিয়ে বন্ধ করা, তার উপর সম্রাটের শিলমোহর।"

"প্রভু, আপনি আবার আসবেন তো! দেশের দূরতম প্রান্ত থেকেও আমি ছুটে আসব আপনার কাছে," বসুভূতি বলে।

"চৌদ্দ বছর হল আমি দেশ ছেড়েছি," ভিক্ষু উত্তর দেন; "যে সব বই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, সেগুলি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে বাকি জীবনটা কাটবে। কিন্তু বুদ্ধের দেশে আমি যে ভালবাসা ও আতিথেয়তা পেলাম, তা আমার চিরকাল মনে থাকবে।"

এই পর্যায়ে প্রকাশিত বই :

বাপু (মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবনী—দুই খণ্ডে)	লেখা ও চিত্র : এফ. সি. ফ্রীটস
কাশ্মীর	চিত্রশিল্পী : প্রেমানন্দ শর্মা লেখিকা : মালা সিং
পক্ষী জগৎ	জমাল আরা
নদী কথা	লীলা মজুমদার
শিখর থেকে শিখরে	ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং
স্বর্গ ভ্রমণ ও অন্যান্য গল্প	লীলাবতী ভাগত
সরস গল্প	মনোজ দাস
স্বরাজ্যের কাহিনী (১ম খণ্ড)	বিষ্ণু প্রভাকর
ভারতে বিদেশী যাত্রা	কে. সি. খান্না
আমাদের রেলের কথা	জগজিৎ সিং
এস, আমরা নাটক করি	উমা আনন্দ
বাঘের মাসা বেড়াল	এম. ডি. চতুর্বেদী
সে অনেক কালের কথা (১ম খণ্ড)	এম. চোকসী ও পি. এম. যোশী
রোহান্তা ও নান্দ্রিয়া	কৃষ্ণ চৈতন্য
যুগ যুগের কাহিনী	শান্তা রঙ্গচারী
বড়পানি	লীলা মজুমদার
বীরের কাহিনী	রাজেন্দ্র অবস্তি
যে-সব আবিষ্কারে দুনিয়া পালটে গেছে	মীর নাজাবাত আলি

প্রত্যেকটি বইয়ের দাম 2.50

এইসব বই সমস্ত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়

